বাংলাদেশ মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৯

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সংবিধান একটি সংসদীয় সরকার ব্যাবস্থা সমর্থন করে যেখানে বেশিরভাগ ক্ষমতা থাকবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদে থেকে শেখ হাসিনা এবং তার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ (আ.লী.) টানা তৃতীয়বারের মত জয় লাভ করেছে। ব্যালট বাক্স কারচুপি, ভোটারদের ভয় দেখানো এবং বিরোধী দলীয় ভোট গ্রাহক প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্টদের ভয় দেখানো সহ বিবিধ অনিয়মের কারণে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের এই নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে বিবেচনা করা যাচ্ছে না। নির্বাচনী প্রচারণার সময় হয়রানি, হুমকি, অবাধ গ্রেপ্তারসহ বিবিধ সহিংসতার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন ছিল, যার ফলে বিরোধী দলীয় অনেক প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের স্বাধীনভাবে সভা- সমাবেশ এবং প্রচারকার্যে ব্যাঘাত ঘটেছে। একটি নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলকে স্বীকৃতি ও ভিসা প্রদান করা হয় নি এবং ২২ টি বেসরকারি নির্বাচনী কার্যকরী সংস্থার (এনজিও) মধ্যে মাত্র ৭ টি সংস্থাকে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যেমন পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) – এর মত বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বিভাগগুলো একসাথে দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীদের মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ। এছাড়াও দেশের কিছু অভ্যন্তরীন সুরক্ষার দায়ভারও রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপর। সুরক্ষা বাহিনীসমূহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কাছে এবং সামরিক বাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। বেসামরিক কর্তৃপক্ষ দেশের সুরক্ষা বাহিনীর উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: বেআইনী অথবা অবাধ হত্যাকান্ড; জোরপূর্বক গুম; নির্যাতন; সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষ থেকে অবাধ অথবা বেআইনী আটক; কঠোর এবং প্রাণঘাতী কারাগার শর্ত; একান্ত ক্রীয়াকলাপের মধ্যে বেআইনী ও অবাধ হস্তক্ষেপ; সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার, সেন্সরশিপ, সাইট ব্লক করা এবং অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা আরোপ; বেসরকারী সংস্থাসমূহ তথা এনজিও গুলোর উপর অত্যধিক সীমাবদ্ধ আইন আরোপসহ তাদের কার্যক্রমের উপর বিধি নিষেধ আরোপ এবং শান্তিপূর্ণ সভা–সমাবেশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ; অবাধ চলাচলের স্বাধীনতার উপর উল্লেখযোগ্য বাধা; রাজনিতীতে অংশ গ্রহণে বিধি নিষেধ আরোপ, নির্বাচনগুলো অবাধ, অকৃত্রিম অথবা সুষ্ঠ মনে হয় নি; উল্লেখযোগ্য দুর্নিতীর নমুনা; মহিলা ও মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক সহিংসতা; মানব পাচার; আদিবাসীদের উদ্দেশ্য করে সহিংসতা বা সহিংসতার হুমকির সম্পর্কিত অপরাধসমূহ; লেসবিয়ান, সমকামী, উভকামী, হিজড়া এবং উভলিঙ্গতা (এলজিবিটিআই) ব্যক্তির বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং সমলিঙ্গের যৌন আচরণকে অপরাধ হিসাবে দুর্বৃত্তায়ন; স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন এবং শ্রমিকের অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ; এবং শিশুশ্রমের নিকৃষ্টতম ধরণ গুলোর ব্যাবহার।

আইন- শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষমতার অপব্যাবহারের দায়ে তাদের ব্যাপকহারে অব্যাহতির খবর পাওয়া গেছে। আইন- শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা তদন্ত ও বিচারের জন্য সরকার বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

অনুচ্ছেদ ১. ব্যাক্তির স্বতন্ত্রতার প্রতি শ্রদ্ধা, এবং যেসমস্ত বিষয় থেকে স্বাধীনতা প্রয়োজন:

ক. জীবনের ও অন্যান্য বেআইনী বা রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রেণিত হত্যার অবাধ বঞ্চনা

সংবিধানে জীবন যাপনের অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার বিধান রয়েছে। সরকার বা সরকারের নানা প্রতিনিধিগণ নির্বিচারে বা বেআইনীভাবে হত্যাকান্ড চালাচ্ছে – এ বিষয়ে বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সারা বছর জুড়ে চালানো অভিযানগুলো মূলত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, মদক এবং অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। বেশ কিছু অভিযান, গ্রেপ্তার এবং আইন প্রয়োগকারী অন্যান্য কর্মকান্ডের সময় সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। নিরাপত্তা বাহিনী প্রায়ই এমন কিছু মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকে যেখানে তারা কোন সন্দেহভাজনকে সাথে নিয়ে অস্ত্র অথবা আলামত জব্দ করতে যায় এবং আসামীর সহযোগীরা পুলিশের উপর গুলি চালায়। ফলে পালটা গোলাগুলির কারণে প্রায়ই সন্দেহভাজনের মৃত্যু হয়। সরকার সাধারণত এই ধরণের মৃত্যুগুলোকে "ক্রসফায়ার হত্যাকাণ্ড," "বন্দুকযুদ্ধ" বা "এনকাউন্টার হত্যাকাণ্ড" হিসাবে বর্ণনা করে। দেশের গণমাধ্যমগুলোও পুলিশি এই সকল হত্যা গুলো বর্ণ্না করতে এই শব্দ গুলো ব্যাবহার করে। এই ক্রসফায়ারের ঘটনাগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বলে দাবি করেছে মানবাধিকার ও গণমাধ্যম সংস্থাগুলো। মানবাধিকার সংস্থাগুলো কিছু ক্ষেত্রে দাবি করেছে যে আইন প্রয়োগকারী ইউনিট সন্দেহভাজনদের আটক, জিজ্ঞাসাবাদ ও নির্যাতন করে এবং পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে নিয়ে তাদের মৃত্যু কার্যকর করে। এই মৃত্যুদন্ডকে সহিংস হামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আইনী আত্মরক্ষা বলা হয়।

গুরুতর শারীরিক আঘাত বা মৃত্যুর ঘটনাসহ পুলিশ বাহিনীর যেকোন কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে পুলিশ নীতিমালা অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়। এ তদন্ত সাধারণত একটি পেশাদার মানের ইউনিট দ্বারা পরিচালিত হয় যা সরাসরি পুলিশ মহাপরিদর্শককে প্রতিবেদন দেয়। সরকার নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা সর্বমোট হত্যার কোন পরিসংখ্যান প্রকাশ নি। সেই সাথে তাদের ব্যাপারে ব্যাপক আকারে বিশেষ কোন তদন্তের ব্যাবস্থা করেনি। এই তদন্ত পরিচালনাকারী ইউনিটগুলোর তদন্তের পেশাদার মান ও স্বাধীনতার ব্যাপারে মানবাধিকার সংস্থাগুলো সন্দেহ প্রকাশ করেছে। দোষী সাব্যাস্ত হওয়ার পর কেবল প্রশাসনিক শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এমন উদাহরণ কেবল অল্প কিছু অভিযোগের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

জুলাই মাসে উচ্চ আদালতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের দায়িত্বপালনের সময় আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয় – " আমরা 'বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড' পছন্দ করি না।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিজেদেরকে আত্মরক্ষার জন্য বেশিরভাগ সময় বিচারবহির্ভূত হত্যা করতে বাধ্য হতে পারে। তবে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচিৎ অপরাধীদের গ্রেপ্তারের অভিযান পরিচালনা করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা এবং সেই সাথে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হওয়া। তাদের উচিত গ্রেপ্তারের সময় অভিযুক্তদের জন্য সকল আইনী সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।"

নভেম্বর মাসের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক ২০১৮ সালে অভিযুক্ত প্রায় ৪৬৬ টি বিচারবহির্ভূত ঘটনার প্রতিবেদন পাওয়া যায় যার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় তিন গুণ। এছাড়াও এই সংখ্যক ঘটনা কোন স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দ্বারা এক বছরে প্রতিবেদন দেয়া সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ঘটনা। 'অধিকার' নামের একটি দেশীয় মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনে জানা যায় যে জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক ক্রসফায়ারের ঘটনায় ৩১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং নাগরিক সমাজ অভিযুক্ত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গ্রেপ্তারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং তারা দাবি করে যে হতাহতদের অনেকেই ছিল নিরপরাধ।

আগস্ট মাসের ৬ তারিখে যশোরে শিশির ঘোষ নামের এক ব্যাক্তি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে "বন্দুক যুদ্ধে" নিহত হন। ঘটনাটি স্থানীয় একটি ইটের ভাটায় হয় যেখানে পুলিশের ধারনা অনুযায়ী অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখা হয়েছিল। পুলিশের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যখনই শিশির ঘোষকে ইটের ভাটায় নিয়ে যাওয়া হয় তখনই তার "সহযোগীরা" গুলি বর্ষণ শুরু করার মধ্যমে একটি বন্দুক যুদ্ধের সূচনা করে। ফলস্বরূপ সেই বন্দুক যুদ্ধে শিশির ঘোষের মৃত্যু হয়। পুলিশ দাবি করে যে শিশির ঘোষের বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুদ এবং চাঁদাবাজিসহ ১৭ টি সক্রিয় অভিযোগ ছিল। ঘোষের পরিবার অবশ্য পুলিশের এ দাবির বিরোধিতা করে। পরিবার জানায় যে তাকে কেবলমাত্র ১০-১২ টি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ঘোষের সমস্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জামিনে ছিলেন তিনি এবং তার বিরুদ্ধে কোন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল না।

২০১৮ সালের মে মাসে ব্যাবের গোলাগুলিতে নিহত কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সিটি পৌরসভার কাউন্সিলর একরামুল হকের মৃত্যুর তদন্তের কোন উন্নতির খবর পাওয়া যায় নি। র‍্যাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে বন্দুকযুদ্ধের সময় একরামুল হককে হত্যা করা হয়েছিল। একরামুল হকের পরিবার, র‍্যাবের আনা মাদকের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগের বিরোধিতা করে এবং তারা বন্দুকের গুলির শব্দসহ গভীর আর্তনাদ সম্বলিত অডিও ক্লিপ সাংবাদিকদের কাছে সরবরাহ করে। হকের মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান গণমাধ্যমকে বলেছেন, তার মন্ত্রনালয় এই ঘটনা তদন্তের জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেবে।

খ. গুম

মানবাধিকার সংস্থা এবং গনমাধ্যম গুলোর প্রতিবেদনে নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা গুম ও অপহরণ অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। সরকার এ জাতীয় কর্মকান্ড প্রতিরোধ বা তদন্তের ব্যাপারে খুবই সীমিত প্রচেষ্টা চালায়। কথিত নিখোঁজ হওয়ার পরে, সুরক্ষা বাহিনী কিছু মানুষকে

বিনা অভিযোগে মুক্তি দিয়েছে, অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করেছে, কিছু মানুষকে মৃত অবস্থায় পেয়েছে এবং কিছু মানুষকে কখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে প্যারিস-ভিত্তিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব হিউম্যান রাইটস এর এক প্রতিবেদনে ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে জোড়পূর্বক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাসমূহ অনুসরণ করা হয়। এই প্রতিবেদনে একটি প্যাটার্ন বা মিল খুজে পাওয়া যায় যে নিখোঁজ হওয়া ব্যাক্তিদের প্রায় প্রত্যেকেই কর্তৃপক্ষের দ্বারা পূর্ব চিহ্নিত ছিল। সাক্ষীদের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে যে যারা পরবর্তীতে নিখোঁজ হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রেও একই ধরণের আইনী কৌশল অবলম্বন করা হয়; এবং নিখোঁজ হওয়ার পরে কর্তৃপক্ষ নিখোঁজ ব্যাক্তিদের স্বজনদের সাথে হেয় বা হুমকি স্বরূপ আচরণ করে।

জাতিসংঘের একটি কার্যকরী দল জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য দেশে আসতে চাইলে সরকার পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা বারবার জোরপূর্বক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা অস্বীকার করে এবং দাবি করে যে ভুক্তভোগীরা স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করে আছে। জুলাই মাসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, নিখোঁজ হওয়া এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান ও নাকোচ করেন। তিনি বলেন, "আমরা আপনাকে জোর দিয়ে বলতে পারি যে এই সরকারের সময়কালে নিখোঁজ হওয়া বা বিচার বহির্ভূত হত্যার কোন ঘটনা ঘটেনি। গত দশ বছর ধরে দেশে কোনো অনাচার হয় নি এবং সরকারের বিরূদ্ধের প্রতিবাদ বন্ধ করার উদ্দ্যেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্যাতনের স্বীকার কেউ হয় নি।" ২০১৭ সালের একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তে গুম হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয় এবং পুলিশের তদন্ত বিষয়ক দপ্তরকে নিখোঁজ ব্যক্তিদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো জানায় যে তারা সারা বছর ধরে সমস্ত গুমের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

গ. নির্যাতন এবং অন্যান্য নির্মম, অমানবিক বা বাজে আচরণ বা শাস্তি

যদিও সংবিধান এবং আইন এ ধরণের নির্যাতন ও অন্যান্য নির্মম, অমানবিক বা বাজে আচরণ বা শাস্তি নিষিদ্ধ করেছে, তবুও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে পুলিশ ও গোয়েন্দা পরিষেবাসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রয়োগ করা বিভিন্ন নির্যাতন বা শাস্তির নজির পাওয়া যায়। কথিত জঙ্গি এবং রাজনৈতিক বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্যাতনের ব্যবহার করেছে বলে জানা গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান, মারধর, হাঁটু গেঁথে শাস্তি, বৈদ্যুতিক শকের ব্যাবহারসহ কখনও কখনও ধর্ষণ ও অন্যান্যা যৌন নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আগস্ট মাসে জাতিসংঘের কমিটি এগেইন্সট টর্চার (CAT) সংস্থাটি আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা স্বীকারোক্তি গ্রহণের জন্য অথবা ঘুষ নেওয়ার জন্য ব্যাপক নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে। ক্যাটের প্রতিবেদনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর বিশেষত র‍্যাবের জবাবদিহিতা প্রদানের ব্যার্থতাসহ বিভিন্ন ঘটনার তথ্য জনসম্মুখে না আনার উল্লেখ রয়েছে।

জুন মাসে স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' এর মতে তাহমিনা বেগম নরসিংদীর গোয়েন্দা শাখার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে গোয়েন্দা সংস্থাটি তার ছেলের আটক পরিস্থিতিকে ব্যাবহার করে চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্থ প্রদানে বাধ্য করার চেষ্টা করেছে। যখন তিনি তার ছেলের মুক্তির জন্য ৫০০,০০০ বাংলাদেশি টাকা (বিডিটি) অথবা (৬,০০০ মার্কিন ডলার) দিতে অস্বীকার করে তখন পুলিশ তার ছেলে সোহেল মিয়াকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে শাস্তি দেয়। পরবর্তীতে যখন তার ছেলেকে ক্রসফায়ারে হত্যা করার হুমকি দেয়া হয় তখন সে পুলিশকে ১০০,০০০ বাংলাদেশী টাকা (বিডিটি) বা ১,২০০ মার্কিন ডলার প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে সোহেল মিয়াকে মুক্তি দেয়া হয়।

আইনে ম্যাজিস্ট্রেট সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদমূলক হেফাজতে রাখার অনুমতি পান যা রিমান্ড নামে পরিচিত। এই রিমান্ডের সময় আইনজীবীর অনুপস্থিতিতেই সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। রিমান্ড চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে বলে মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করেছে।

অক্টোবর মাসে গণমাধ্যমের এক খবরে বলা হয়, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী একটি ১২ বছর বয়সী রোহিঙ্গা কিশোরীর ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে। কিশোরীর ভাই, মোহাম্মদ ওসমানের ভাষ্যমতে, সেপ্টেম্বরের ২৯ তারিখে তিনজন সেনা সদস্য তাদের ঘরে ঢুকে তার বোনকে ধর্ষণ করে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্ত চলাকালীন সময়ে ওসমান দাবি করেন যে সুরক্ষা বাহিনী তার পরিবারকে হুমকি দেয় এবং পুলিশের কাছে মামলা না করার জন্য অনুরোধ করে। হুমকির ফলস্বরুপ ওসমান ও তার পরিবার পুলিশি মামলা করে নি।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের প্রতিবেদন দেওয়ার সময় "উস্কানিমূলক বক্তব্য" দেওয়ার জন্য ২০১৮ সালের আগস্টে গ্রেপ্তার হওয়া ফটো সাংবাদিক শহিদুল আলমের উপর কারাগারে নির্যাতন করার অভিযোগ এসেছিল। হাইকোর্টে একটি আবেদন দায়েরের পর ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। শহিদুল আলমের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনও বিচারাধীন অবস্থায় আছে। ১৮ ই আগস্ট, শাহিদুল আলমের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত স্থগিতের জন্য হাই কোর্টের আদেশ বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্ট।

কারাগার ও বন্দিশালার পরিস্থিতি

কারাগারের পরিস্থিতি বরাবরের মতই কঠোর। জনবহুলতা, অপর্যাপ্ত সুযোগ- সুবিধা এবং যথাযথ স্বাস্থ্য সম্মত বসবাস ব্যাবস্থা না থাকায় এটি জীবনের জন্য ঝুকিপূর্ণও বটে। কোন প্রকার ব্যাক্তিগত আটক ব্যাবস্থা নেই এখানে।

কাঠামোগত অবস্থা: কারা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সেপ্টেম্বর মাসে ৩৭,০০০ কয়েদী বসবাস উপযোগী একটি ব্যাবস্থায় প্রায় ৮০, ০০০ এরও বেশি কয়েদীকে রাখা হয়। কর্তৃপক্ষ প্রায়ই দোষী সাব্যস্ত বন্দীদের সাথে আদালতের রায়পূর্ব বন্দীদের আটক করে রাখে।

সেপ্টেম্বর মাসের এক গণমাধ্যম প্রতিবেদনে জানা যায় যে প্রায় ৮০,০০০ এরও বেশি কয়েদীর জন্য কেবল মাত্র নয় জন চিকিৎসক ছিল কারাগারে এবং দেশের প্রায় ৬০ কারাগারে কোন চিকিৎসকই ছিল না। কারা অধিপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক জানান ২০১৮ সালে প্রায় ৩১৬ জন কয়েদী অসুস্থতায় মারা যায়। প্রতি মাসে প্রায় ২৬ জন হারে জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৮৮ জন বন্দী যক্ষ্মা, ডায়াবেটিস এবং কিডনি ও যকৃত জনিত সমস্যায় অসুস্থ হয়ে মারা যায়। কারাবন্দীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান ও চিকিৎসকদের অভাব পূরণের লক্ষ্যে কারাগার কর্তৃপক্ষ নার্স ও ফার্মাসিস্ট নিয়োগ দেয়া শুরু করে। পেশাদার চিকিৎসা সেবার ঘাটতির কারণে কয়েদীদের প্রায়শই অনেক দেরিতে হাসপাতালে নেয়া হয় এবং পরবর্তীতে তাদের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়।

কারাগারগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। প্রায়ই একই কারাগারের ভেতরের পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃপক্ষ কিছু কয়েদীদের এমন জায়গায় বন্দী করে রাখে যেখানে প্রচন্ড গরম ও বদ্ধ পরিবেশে অনেককে একসাথে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। আইনানুযায়ী কারাকর্মকর্তাগণ যেসকল কয়েদীদের "ভিআইপি" হিসেবে মনোনীত করেন তারা "ডিভিশন এ" টাইপ কারাগারে থাকার সুযোগ পায়। এখানে রয়েছে উন্নত জীবনযাপন ও খাবারের ব্যাবস্থা, ঘন ঘন পারিবারিক সাক্ষাতের সুযোগ ইত্যাদি। ভিআইপি মর্যাদা ব্যাতীত অন্য কিছু কয়েদীকে নানা কাজে সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য "ডিভিশন এ" – তে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়।

আইনানুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে আলাদা রাখার নিয়ম থাকলেও কারাকর্তৃপক্ষ অনেক অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে একসাথে রাখে। আইনানুযায়ী ও আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাবালকদের কারাবন্দী করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে শিশুদের কারাগারে বন্দী করা হয় (মাঝে মাঝে তাদের মায়ের সাথে) । কারাকর্তৃপক্ষ নারী ও পুরুষদের পৃথকভাবে রাখে।

যদিও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মানসিক প্রতিবন্ধীদের আলাদা জন্য সুবিধা রয়েছে। সকল বন্দীশালাগুলোতে এ জাতীয় সুযোগ সুবিধা নেই বা আইনানুযায়ী সেগুলোর প্রয়োজনও নেই। বিচারকগণ মানবিক দিক বিবেচনা করে প্রতিবন্ধিদের সাজা লাঘব করতে পারেন। কারাধ্যক্ষও প্রতিবন্ধি কয়েদীদের জন্য বিশেষ ব্যাবস্থা করতে পারেন, উদাহরণস্বরুপ, প্রতিবন্ধি কয়েদীদের কারাহাসপাতালে স্থানান্তর, ইত্যাদি।

<u>পরিচালনা</u>: কারাগারে কয়েদীদের অভিযোগ জমা নেয়ার কেউ নেই। কারাকর্তৃপক্ষের মতে তারা উল্লেখযোগ্য কর্মী সংকটে রয়েছেন। এছাড়া কয়েদীদের জন্য পুনরায় প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

<u>স্বতন্ত্র নিরীক্ষণ</u>: সরকারী তদন্তকারী দলকে সাথে নিয়ে সরকার সরকারী ও বেসরকারী পরিদর্শকদের জেল পরিদর্শনের অনুমতি দেয়। এ ধরণের পরিদর্শনের কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় না।

ঘ. নির্বিচারে গ্রেপ্তার বা আটক

সংবিধান অনুযায়ী নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং আটক করা নিষিদ্ধ। তবে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ চাইলে ব্যক্তি সুরক্ষা এবং গণ-শৃঙ্খলার প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে এমন কাউকে ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে বা ওয়ারেন্ট আদেশ ছাড়াই গ্রেপ্তার ও আটক করতে পারে। আইন প্রয়োগকারীরা তাদের গ্রেপ্তারকে ন্যায্য প্রমাণ করার জন্য এই আইনটিকে ব্যাপকভাবে ব্যাবহার করে। সংবিধানে যেকোন ব্যক্তির আদালতে তার গ্রেপ্তার বা আটকের বৈধতা প্রশ্ন করার অধিকারের রয়েছে। তবে সরকার সাধারণত এই দিকটি দৃষ্টিজ্ঞাপন করে। গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ তোলে যে সরকার শুধুমাত্র সন্দেহভাজন জঙ্গিদের নয়, সুশীল সমাজ ও বিরোধী দলের সদস্যদের গুম অথবা অপহরণ করছে। কখনও কখনও কর্তৃপক্ষ আটককৃতদের পরিবারের অগোচরে কোন প্রকার আইনী সহায়তা ছাড়া , অথবা গ্রেপ্তার না করেও আটক করে রাখে।

গ্রেপ্তার পদ্ধতি এবং আটককৃতদের প্রতি আচরণ

সংবিধান অনুসারে গ্রেপ্তার বা আটক করার জন্য অনুমদিত ওয়ারেন্ট লাগবে অথবা দোষীকে অপরাধকর্ম সম্পাদন করা অবস্থায় ধরতে হবে। কিন্তু কিন্তু ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এর ব্যাতিক্রম সমর্থন করে।

সংবিধানের আওতায়, আটককৃতদের অবশ্যই বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আনতে হবে, তবে এই বিধানটি সচরাচর প্রয়োগ করা হয় না। সরকার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে হুমকিস্বরূপ কোন ব্যাক্তিকে ৩০ দিনের জন্য আটক করার আদেশ দিতে পারেন; তবে কর্তৃপক্ষ কখনও কখনও আটককৃতদের দীর্ঘকাল ধরে বিনা অব্যাহতিতে আটকে রাখে।

আইনে একটি কার্যকরী জামিন ব্যবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিয়মিতভাবে জামিন পাওয়া ব্যাক্তিদের অন্যান্য অভিযোগে গ্রেপ্তার করছে; যেখানে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের ২০১৬ সালের নির্দেশ অনুযায়ী জামিনপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের পুনরায় আদালতে প্রেরণ ব্যাতিত গ্রেপ্তারের অনুমতি নেই।

কর্তৃপক্ষ সাধারণত আদালতে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের পরে পক্ষসমর্থিত আইনজীবীদের তাদের মক্কেলদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক গ্রেফতারের কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পরেও ঘটে। বন্দীদের সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও তারা আইনীভাবে পরামর্শ লাভের অধিকারী। কিন্তু এই ধরণের আইনী সুযোগ সুবিধা সরবরাহের জন্য দেশে পর্যাপ্ত তহবিলের ঘাটতি রয়েছে।

নির্বিচারে গ্রেপ্তার: সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অথবা রাজনৈতিক বিক্ষোভের ফলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে নির্বিচারে গ্রেপ্তার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও সরকার

সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই ব্যক্তিদের আটকে রাখে। কখনও কখনও অন্যান্য সন্দেহভাজনদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রয়াসেও আটক করে রাখা হয়। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এ ধরণের গ্রেপ্তারের আইনী যৌক্তিকতা দেয় যা অন্যথায় নির্বিচার হিসেবে বিবেচিত হত। এই আইনটি পূর্বে সংঘটিত অপরাধের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারকার্য সম্পাদনের বিষয়টিকে অপসারিত করেছে। মানবাধিকার কর্মীরা দাবি করেন যে পুলিশ বিরোধী দলীয় নেতা, কর্মী এবং সমর্থকদের লক্ষ্য করে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। এছাড়াও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন করার জন্য ব্যবহার করছে। ২০১৮ সালে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা কমপক্ষে ১০০ জন শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, যাদের বেশিরভাগই কোটা সংস্কার এবং নিরাপদ সড়কের দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনে অংশ নেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের পেছনে গোয়েন্দা তদারকী ও গ্রেপ্তারের জন্য ১৫ জন কর্মকর্তাকে পুরষ্কিত করে।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১১ই মে- তে ময়মনসিংহ পুলিশের গোয়েন্দা শাখা সাংবাদিক এবং মানবাধিকারকর্মী, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুমকে গ্রেপ্তার করে। একটি বৈঠকে কাইয়ুমের ক্লায়েন্ট মোহাম্মদ ইদ্রিস খান তাদের ১২০,০০০ টাকা (বিডিটি) (১৪০০ মার্কিন ডলার) চুক্তির জন্য কাইয়ুমকে দু'শো ডলার প্রদানের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কাইয়ুম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শুধু মাত্র বাংলাদেশী টাকা গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে। তিনি যখন ইদ্রিস খানের কার্যালয় ত্যাগ করেন, ময়মনসিংহ পুলিশ কোনও ওয়্যারেন্ট ছাড়াই কাইয়ুমকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে মার্কিন ডলার বহন এবং "বৈদেশিক মুদ্রার অবৈধ ব্যবসা"–র সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আনে। যদিও তারা কাইয়ুমের কাছে কোন বৈদেশিক মুদ্রা খুজে পায় নি। পুলিশী হেফাজতে থাকাকালীন সময়, দায়িত্বে থাকা একজন অফিসার ও সাব-ইনস্পেক্টর কাইয়ুমকে মারধর করে। জুলাই মাসের ২ তারিখে কাইয়ুম জামিনে ছাড়া পায়।

ট্রায়াল পূর্ব আটক অবস্থা: আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা, সীমিত সুযোগ- সুবিধা, ট্রায়াল পূর্ব বিধি প্রয়োগের শিথিলতা এবং দুর্নীতির কারণে নির্বিচারে ও দীর্ঘ সময় ধরে ট্রায়াল পূর্ব আটক করে রাখা অব্যাহত ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রায়াল পূর্ব আটকের সময়কাল অভিযুক্ত অপরাধের সাজার সমতুল্য হয় অথবা এই সময়কালকেও অতিক্রম করে।

ঙ. স্বচ্ছ সার্বজনীন ট্রায়াল অস্বীকার

আইন একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ সমর্থণ করে। তবে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে বিচার বিভাগের এই স্বাধীনতা হ্রাস পায়। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকগণ ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাটর্নি থেকে শুরু করে আদালতের অন্যান্য কর্মকর্তাদের আসামিদের কাছ থেকে ঘুষ দাবি করতে দেখে থাকেন। কিংবা মাঝে মাঝে আদালতের রায়সমূহ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুগত্যের ভিত্তিতে হয়। পর্যবেক্ষগণ দাবি করেন, যে বিচারকগণ সরকারের পক্ষে রায় দেয় না তাদেরকে অন্য বিচার বিভাগে স্থানান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি নিতে হয়। কর্মকর্তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবীদের তাদের নিজ নিজ মক্কেলদের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন।

দুর্নীতি এবং আদালতে দিনের পর দিন জমে থাকা মামলাসমূহ আদালত ব্যাবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে। সেই সাথে আদালতের প্রচন্ড বর্ধিত ধারাবাহিকতা কার্যকরভাবে অনেক আসামীকে তার ন্যায্য বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে।

ফেব্রুয়ারী মাসে উচ্চ আদালত কারা কর্তৃপক্ষকে পাট কারখানার শ্রমিক জাহালমকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেয় যে কিনা ভুল শনাক্তকরণের কারণে ঋণ জালিয়াতি ও আত্নসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। মুক্তি পাওয়ার পূর্বে জাহালম তিন বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তাকে অভিযুক্ত অন্য সন্দেহভাজন আবু সালেকের সাথে বিভ্রান্ত হয়ে সাজা প্রদান করেছিল। একাধিকবার আদালতে হাজির হওয়া সত্ত্বেও আদালত জাহলামকে আবু সালেক হিসাবে চিহ্নিত করতে থাকে। ২০১৮ সালের আসামী সনাক্তকরণের সাঙঘাতিক ভুলের ব্যাপার সমূহ সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচার হলে উচ্চ আদালত জাহালমের কারাদন্ডকে ভিত্তিহীন হিসেবে রায় দিয়ে তাকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়। সেই সাথে কারা কর্তৃপক্ষ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) - কে অন্যায়ভাবে কারাবাসে পাঠানোর জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয় উচ্চ আদালত। অতঃপর রায় দেওয়ার পর জাহলামকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তবে বছরের শেষ অবধিও জাহালামকে তার ভুল কারাবাসের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।

আদালতের বিচার প্রক্রিয়া

সংবিধানে একটি ন্যায্য ও প্রকাশ্য বিচারের অধিকার লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্বল মানব সম্পদের কারণে বিচার বিভাগ সর্বদা এই অধিকার রক্ষা করতে পারে না।

যেসকল আসামীদের নির্দোষ বলে গণ্য করা হয়, সেসকল আসামীদের আপিল করার অধিকার রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ও বিস্তারিতভাবে জানার অধিকার রয়েছে। পারতপক্ষে আসামিদের ন্যায্য, সময়োপযোগী এবং প্রকাশ্য বিচারের অধিকার নেই। অভিযুক্তরা তাদের সার্বজনীন বা প্রকাশ্য বিচারে উপস্থিত থাকার অধিকার রাখে। অভাবগ্রস্ত আসামীদেরও পাবলিক ডিফেন্ডার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বাংলা ভাষায় সকল বিচারকার্য পরিচালিত হয় এবং যেসকল বিবাদী বাংলা বুঝতে বা বলতে পারে না তাদের জন্য সরকার বিনামূল্যে অনুবাদক সরবরাহ করে না। বিবাদীদের প্রস্তুত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মামলা-মোকদ্দমা বা বাদী সাক্ষীর মুখোমুখি হওয়ার এবং তাদের নিজস্ব সাক্ষী ও প্রমাণ উপস্থাপনের অধিকার রয়েছে। বিবাদীদের তাদের অপরাধের সাক্ষ্য বা স্বীকৃতি না পেশ করার অধিকারও রয়েছে। তবে সেসকল অভিযুক্তরা অপরাধ স্বীকার করে না তাদের প্রয়শই পুলিশী হেফাজতে রাখা হয়। সরকার এই সকল অধিকারকে প্রায়শই আমলে নেয় না।

কার্যনির্বাহী শাখা ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতগুলো অবিলম্বে রায় প্রদান করে যে রায়গুলোর মধ্যে প্রায়শই কারাদন্ড থাকে। এসকল আসামীদের আদালতের যাবতীয় আইনী সুযোগ সুবিধা থাকে না। বিভিন্ন জেলা প্রশাসকরা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ২০০৯ সালের ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন সংশোধনপূর্বক দ্রুত ছাড়পত্র প্রদান করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন। বছরের শেষ নাগাদও সংসদ এ জাতীয় আইনের ছারপত্র দেয়নি।

রাজনৈতিক বন্দী এবং কারাব্যাবস্থা

বহুল সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দী বা আটককৃতদের খবর পাওয়া যায়। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে রাজনৈতিক বিরোধী দলীয় নেতা- কর্মীদের প্রায়শই গেপ্তার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে বড়সড় মামলা দায়ের করার খবর পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দাবী করে যে প্রায়শই হুমকি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্বিচারে তাদের নেতা-কর্মীদের সমাবেশ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়, যেখানে সমাবেশগুলো পরিকল্পিত ও প্রাক- অনুমোদিত ছিল।

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দুর্নীতি ও আত্মসাতের অভিযোগে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হয়। ২০০৮ সালে প্রথম নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এই মামলা দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে উচ্চ আদালত কর্তৃক এ সাজা ১০ বছর দীর্ঘায়িত করা হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইন বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন খালেদা জিয়ার দোষ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না এবং সমস্ত প্রক্রিয়াটিই বিরোধীদলীয় নেতাকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে অপসারণের জন্য একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। সাধারণত আদালত জামিনের আবেদনের বিষয়ে বিবেচনার ব্যাপারে বেশ ধীর গতির এবং জিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার সংবাদ সত্ত্বেও সম্প্রতি ডিসেম্বরে তার জামিন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

১৯৯৪ সালে বিরোধী দলের নেতা থাকাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনে হামলার অভিযোগে ৩ জুলাই আদালত নয় জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং পঁচিশ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত করে। যদিও এই হামলার ফলে একাধিক হতাহতের ঘটনা ঘটে, তবে প্রধানমন্ত্রী অক্ষত অবস্থায় ছিলেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সকলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র সদস্য ছিলেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই রায়য়ের নিন্দা জানিয়ে বলেন যে মামলাটি "জাল ও মনগড়া" এবং সেইসাথে হামলাটিকে আওয়ামী লীগের সাজানো হামলা বলে অভিযোগ করেন তিনি।

নাগরিক বিচারসংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি এবং প্রতিকার

ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিচারসংক্রান্ত প্রতিকার চাইতে পারে; তবে আদালত কার্যপদ্ধতিতে জনসাধারণের বিশ্বাসের অভাব থাকায় অনেকেয়েই অভিযোগ দায়ের করতে পিছপা হন। আইনে ন্যায়পালের জন্য আলাদা বিধান থাকলেও সেটি সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

সম্পত্তি পুনরুদ্ধারকরণ

প্রাথমিকভাবে হিন্দুদের জমি ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ২০০১ সালের ভেস্টেড প্রপার্টি (রিটার্ন) আইন তৈরি করে যেটি এখন পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয় নি (৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । এই আইন সরকারকে রাষ্ট্রের বিরোধী হিসেবে ঘোষণা করা ব্যাক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দেয়। প্রায়শই সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলের জন্য এই আইনটি ব্যবহৃত হত, বিশেষত একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে।

নতুন রাস্তা ও শিল্পন্নায়ণের ফলে যে সকল স্থানের জমির দাম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে সে সকল স্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর জমির বিরোধ বরাবরের মতই অব্যাহত রয়েছে। তারা দাবি করে যে স্থানীয় পুলিশ, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং রাজনৈতিক নেতারা কখনও কখনও উচ্ছেদকার্যে জড়িত থাকে বা তারা রাজনৈতিক প্রভাবশালী ভূমি দখলদারদের বিভিন্ন মামলা থেকে রক্ষা করে চলেছে (৬ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) । চট্টগ্রামে বসবাসকারী আদিবাসীদের জমি পুনর্বাসনের অনুমতি দেওয়ার আশ্বাসে ২০১৬ সালে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে এখনও কোন প্রকার বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি (অনুচ্ছেদ ২.ঘ দ্রষ্টব্য)।

চ. গোপনীয়তা, পরিবার, বাড়ি বা সাযুজ্যের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী বা বেআইনী হস্তক্ষেপ

আইন ব্যাক্তিগত ব্যাপারে সেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে বাধা দেয় না। গোয়েন্দা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অনুমতি নিয়ে একান্ত নিজস্ব যোগাযোগ বা আলাপচারিতা পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তবে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বা বার্তা পর্যবেক্ষণের জন্য পুলিশ আদালতের কাছ থেকে এ ধরনের অনুমতি খুব কমই পেয়ে থাকে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো অভিযোগ করে যে, যেই নাগরিকগণ সরকারের সমালোচনা করে তাদের ব্যাপারে নজরদারী ও তথ্য সংগ্রহের উদ্যেশ্যে বাংলাদেশ পুলিশ, জাতীয় সুরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা এবং অধিদপ্তরিক জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স তথ্য দাতাদের নিযুক্ত করেছে।

দিনে দিনে সরকার নাগরিকদের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর উপর নজরদারী বৃদ্ধি করছে। সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে "গুজব সনাক্ত করতে" একটি মনিটরিং সেল বা পর্যবেক্ষণ দল গঠন করে। ২৮

শে জুন, ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বার বলেন যে নিরাপদ ইন্টারনেট তৈরি করতে সরকার সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যে কোনও বিষয়বস্তুতে হস্তক্ষেপ শুরু করবে। এই উদ্যোগ সংবিধানের আওতার বাইরে গিয়ে নাগরিকদের বাকস্বাধীনতার অধিকারে বাধা বয়ে আনার আশঙ্কাতে নাগরিক সমাজ উদ্বেগ প্রকাশ করে।

অনুচ্ছেদ ২. নাগরিকদের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান, এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

ক. গণমাধ্যমসহ সকল মত প্রকাশের স্বাধীনতা

সংবিধানে সংবাদমাধ্যমসহ সকলের বাকস্বাধীনতার বিধান রয়েছে, তবে সরকার কখনও কখনও এই অধিকারকে সম্মান করতে বা গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। বাকস্বাধীনতার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিছু কিছু সাংবাদিক হয়রানি ও প্রতিহিংসার ভয়ে নিজের করা সরকারের সমালোচনা সেন্সর করে বা বদলে দেয়।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা: সংবিধানে গঠনতন্ত্রের নিন্দাকে রাষ্ট্রদ্রোহের সমান ধরা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহের শাস্তি তিন বছর থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আইন বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের ব্যাপারে অন্যান্ত সীমাবদ্ধ, তবে কি ধরণের মন্তব্য বিদ্বেষমূলক মন্তব্য হিসেবে পরিগণিত হবে তা আইনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই। ফলসরূপ সরকারের হাতে বিস্তর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষমতা নিহিত। কোন মন্তব্য যদি বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিরুদ্ধে; এবং নাগরিক শৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার বিরুদ্ধে; বা আদালতের অবমাননা, মানহানি, বা কোনও অপরাধের উস্কানিস্বরুপ হলে; কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হলে সরকার সেই মন্তব্যগুলোর উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে। ২০১৬ সালের বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) আইন অনুযায়ী সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর যেকোন সমালোচনা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ব্যাক্তি ও সংস্থার মানহানির দিকটি বিবেচনা করে ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনটি বিরোধী ব্যাক্তিত্ব এবং নাগরিক সমাজের বিচারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাইবার অপরাধ হ্রাস করার লক্ষ্যে ২০১৮ ডিজিটাল সুরক্ষা আইন (ডিএসএ) বাহ্যিকভাবে পাস হয়। এ আইনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে "রটনা" ছড়িয়ে দেওয়ার অপরাধে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান করা হয়। মানবাধিকার গোষ্ঠী, সাংবাদিক, গণমাধ্যমসমূহ এবং রাজনৈতিক বিরোধী দলগুলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা এবং বাক স্বাধীনতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করার জন্য ডিএসএ আইনের নিন্দা জানিয়েছে।

অনলাইন মিডিয়া সহ প্রেস এবং গণমাধ্যম: মুদ্রীত এবং অনলাইন উভয় স্বাধীন মিডিয়া সক্রিয় ভাবে বিভিন্ন ধরণের মতামত প্রকাশ করেছে; তবে, সরকারের সমালোচনা করা সংবাদমাধ্যমগুলোকে সরকারের নেতিবাচক চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম অক্টোবর মাসে উপলব্ধি করে যে বিগত বছরের তুলনায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্রমে হ্রাস পেয়েছে।

সরকার দেশের সরকারী টেলিভিশন স্টেশনের সম্পাদকীয় বিভাগ পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে বিনামূল্যে সরকারী সামগ্রী প্রচার করে। নাগরিক সমাজ সংগঠণগুলো জানায় যে টিভি- চ্যানেলগুলোর সরকারী অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে। সাধারণত ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থনকারী টিভি-চ্যানেলগুলোকেই অনুমোদন দেয়া হয়।

সহিংসতা ও হয়রানি: ডিএসএ (DSA) এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু ঘটনায় গোয়েন্দা পরিষেবাসমূহ এবং ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন সাংবাদিকদের শারীরিক আক্রমণ ও হুমকিসহ নানা রকম হয়রানি করে। মানবাধিকারকর্মীরা ডিএসএ (DSA)-কে সাংবাদিকদের ভয় দেখানোর একটি সরঞ্জাম হিসাবে দেখেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকদের একটি সংগঠন, দি এডিটরস কাউন্সিল জানায় যে ডিএসএ আইনটি তদন্তকারী সাংবাদিকতাকে দমন করছে। প্রচুর ব্যাক্তি গ্রেপ্তার হওয়া, বিচারপূর্ব আটক অবস্থায় রাখা, ব্যয়বহুল ফৌজদারি মামলা, জরিমানা ও কারাদণ্ডসহ নানা রকম ফৌজদারি রেকর্ডের সাথে জড়িত সামাজিক কলঙ্কের মুখোমুখি হয়।

২১ শে অক্টোবর, ডিএসএ-এর অধীনে দায়ের করা মামলায় পুলিশ নিউট ন্যাশন পত্রিকার জেলা সংবাদদাতা এবং খুলনা প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মুনির উদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। তার অপরাধ ছিল সে ভুলবশত ভোলার পুলিশ সুপারের ছবির বদলে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের ছবি তার ফেসবুকে দেন। খুলনা মহানগর হাকিম আদালত তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। যদিও আদালত দুই বার মুনির উদ্দিন আহমেদের জামিন প্রত্যাখ্যান করে। পর্যবেক্ষকগণ রিমান্ড নামে পরিচিত পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে বলেন যে রিমান্ডে মাঝে মাঝেই আটককৃতদের সাথে অসদাচরণ করা হয়। বছরের শেষ অবধি পর্যন্ত মুনির উদ্দিনকে জেলে রাখা হয়।

সেন্সরশিপ বা বিষয়বস্তুর বিধিনিষেধ: স্বতন্ত্র সাংবাদিকগোষ্ঠী এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয় যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মিডিয়া আউটলেটগুলোকে আর্থিকভাবে প্রভাবিত করে। বেসরকারী বিজ্ঞাপণগুলোকে আটকে আর্থিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারী বিজ্ঞাপন বিনাময়ল্যে প্রচার করে সরকার। রাজনৈতিক বিরোধী দলীয় কার্যকলাপ ও বক্তব্য এবং সরকারের সমালোচনা করার জন্য সরকার গণমাধ্যমগুলোকে সাজা দেয়। সীমান্তবিহীন গণমাধ্যমের কর্মীরা অভিযোগ করে যে সাংবাদিকদের ও গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে "স্থানীয় সহিংসতা" এবং "প্রকৃত দায়ীদের প্রায় নিয়মিতভাবে পদ্ধতিগত দায়মুক্তি"-র কারণে সাংবাদিকরা নিজেদের প্রতিবেদন বা খবর সেন্সর করছে।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যমগুলো অবশ্য বিভিন্ন মতামত দেয়ার স্বাধীনতা উপভোগ করে। রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এবং স্ব-সেন্সরশিপ একটি সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। জ্বালাময়ী প্রতিবেদনগুলো প্রায়শই সরকারের ভয়ে বিভিন্ন সম্পাদক ও পরিচালনা পরিষদ নষ্ট করে ফেলে বা সরিয়ে ফেলে বলে অভিযোগ করেন তদন্তকারী সাংবাদিকগণ। কিছু কিছু সাংবাদিকদের তাদের প্রতিবেদনের জন্য হুমকির সম্মুখীন হতে হয়।

কিছু কিছু সাংবাদিক এবং বেসরকারী মানবাধিকার সাংস্থার মতে বেশিরভাগ সাংবাদিকগণ রাজনৈতিক ত্রাশ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে অপদস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের নিজেদের প্রতিবেদন বদলে ফেলেন বা সেন্সর করেন। যদিও সরকারের ব্যাপারে জনসমক্ষে সমালোচনা খুবই সাধারণ বিষয়, তবুও কিছু কিছু গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সরকার কর্তৃক হয়রানির আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

জানুয়ারী মাসের ২ তারিখে, দ্যা ডেইলি স্টার পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় খুলনা থেকে ভোট সংখ্যার ব্যাপারে "ভুল তথ্য" দিয়ে ডিএসএ (DSA) আইন অমান্য করায় খুলনা জেলা প্রতিবেদক হেদায়েত হোসেন মোল্লাকে তদন্তের জন্য আটক করা হয়। নির্বাচনের পরে হেদায়েত হোসেন মোল্লা প্রতিবেদনে বলেন যে প্রাথমিক নির্বাচনের ফলাফলে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ঐ এলাকার যোগ্য ভোটারদের সংখ্যার থেকে বেশি। খুলনার এক নির্বাচনী কর্মকর্তা পরবর্তীতে চূড়ান্ত ভোটের সংখ্যা সংশোধন করে ভোটের সংখ্যা কমিয়ে দেন, তবে ইতিমধ্যে সাংবাদিকদের প্রতিবেদন সব জায়গায় প্রকাশিত হয়ে যায়। এরপর মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে হেদায়েত হোসেন মোল্লাকে ডিএসএর আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও মোল্লাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছিল, তবে মামলাটি সক্রিয় থাকায় বাধ্য হয়ে তাকে নিয়মিত আদালতে হাজির হতে হয়।

সাংবাদিকগণ দাবি করেন যে রাজনৈতিক বিরোধী দলীয় কার্যকলাপ ও বক্তব্য সম্প্রচার এবং সরকারের সমালোচনা করার জন্য সরকার গণমাধ্যমগুলোকে সাজা দেয়। এপ্রিল মাসে সরকার নারায়ণগঞ্জের দৈনিক পত্রিকা "জুগের চিন্তা"-র প্রকাশনা অধিকার বাতিল করে দেয়। সরকারের এই উদ্যোগের প্রতিবাদস্বরূপ নারাগঞ্জে জনগণ মানববন্ধন করে। সাংবাদিকগণ দাবি করেন, দৈনিক যুগের চিন্তা পত্রিকায় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সংসদ সদস্য (এমপি)-র সমালোচনার প্রতিবেদন প্রকাশ করার ফলস্বরূপ সরকার যুগের চিন্তা পত্রিকাকে দন্ডিত করে।

মানহানি/ মিথ্যা অপবাদ আইন: নিন্দা, অপবাদ এবং মানহানিকে সাধারণত অপরাধমূলক কর্মকান্ড হিসাবে গণ্য করা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন সেগুলো সরকার, প্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। ডিএসএ আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোন প্রকার "মিথ্যা প্রজ্ঞাপণ বা রটনা" ছড়িয়ে দেওয়ার অপরাধে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। জুলাই অবধি তদন্তের আবেদন জানিয়ে মোট ৪২০ টি আবেদনের মাধ্যমে এ আইনের আওতায় ৮০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মার্চ মাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ফেডারেশন ইন্টারনেশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ফিফা) কাউন্সিলের সদস্য মাহফুজা খের কিরণকে একটি টেলিভিশন টকশোতে এসে প্রধাণমন্ত্রীর মানহানির দায়ে গ্রেপ্তার করে। মাহফুজা টকশোতে বলেন যে মাননীয় প্রধাণমন্ত্রী ক্রিকেটের পক্ষপাতি হয়ে ফুটবলকে অবহেলা করছেন। সেই সাথে আরও বলেন যে প্রধানমন্ত্রী ফুটবলের সাফল্যকে অগ্রাহ্য করে ক্রিকেটের সাফল্যের জন্য নানা ভাবে পুরষ্কিত করছেন। এপ্রিল মাসে মাহফুজা খের কিরণকে জামিন দেয়া হয়। তবে তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগ বাতিল করা হয়নি।

বেসরকারী প্রভাব: নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ, এবং এলজিবিটিআই লেখক এবং ব্লগারগণ জানায় তারা সহিংস চরমপন্থী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে মৃত্যুর হুমকি পেয়ে আসছে।

ইন্টারনেটের স্বাধীনতা

সরকার বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনলাইন সামগ্রীতে প্রবেশাধীকার সীমিত ও সেন্সর অথবা নিষিদ্ধ করে। সরকার ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক বা ভিপিএন এবং ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলিফোনকে নিষিদ্ধ করে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার কার্যকারীতা খুবই কম ছিল।

বেশ কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ইন্টারনেট সংযোগ ও এর পরিসেবায় হস্তক্ষেপ করে। এর মধ্যে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান, ওয়েবসাইটের অনলাইন সামগ্রীতে সীমিত প্রবেশাধিকারসহ ইন্টারনেট পরিসেবায় আনা আরও নানা সরকারী হস্তক্ষেপ উল্ল্যেখযোগ্য। অনলাইন সামগ্রী দ্বারা আইন ভঙ্গের যথাযথ স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়াই এবং অস্পষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে প্রচুর ওয়েবসাইটের প্রবেশাধিকার স্থগিত বা বন্ধ করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)-র উপর দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আরোপিত। বিটিআরসি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকারের নির্দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীদের আদেশের মাধ্যমে ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা সামগ্রী ব্লক করে। সরকার যেসকল জিনিসপত্র জাতীয় ঐক্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য ক্ষতিকারক বলে মনে করে, বিটিআরসি সেসকল জিনিসপত্র বিশোধন করে।

মার্চ মাসে স্ত্রীর সাথে জড়িত ব্যাবসায়িক বিবাদের জের ধরে তিন ব্যাক্তির নিখোঁজ হওয়ার পেছনে একজন উর্ধ্বতন সুরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা ও সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যাক্তিত্বের জড়িত থাকার ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন আল জাজিরার ইংরেজি সংবাদ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার এক ঘন্টা পরের আল-জাজিরার ওয়েবসাইটটি বন্ধ করে দেয়া হয়। "*জবান*" নামের একটি স্থানীয় সংবাদ ও আলোচনা মাধ্যমে আল-জাজিরার এই প্রতিবেদনটির সারসংক্ষেপ বাংলায় প্রকাশিত হওয়ার পর সেটির প্রবেশাধিকারও কেড়ে নেয়া হয়। পরবর্তীতে অন্য কোন দেশীয় বা বিদেশী গণমাধ্যম এই বিষয়টি নিয়ে আর কোন প্রতিবেদন দেয় নি।

অতীতে, দেশের সুরক্ষা পরিষেবাগুলো সমস্ত আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়েগুলোকে ইমেল করার মধ্যমে বিটিআরসিকে ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। এ বছরের মধ্যে টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং জাতীয় টেলিযোগাযোগ নিরীক্ষণ কেন্দ্র একটি নতুন ব্যাবস্থা চালু করে যার মাধ্যমে সংস্থাগুলো বিটিআরসিকে জড়িত না করেই কেন্দ্রীয়ভাবে ওয়েবসাইট ব্লক বা বন্ধ করার অনুমতি পায়।

একাডেমিক স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ

যদিও একাডেমিক স্বাধীনতা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে সরকার কিছুটা বিধিনিষেধ আরোপ করে। যে সকল সম্ভাব্য রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সংবেদনশীল বিষয়গুলো ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে পারে কর্তৃপক্ষ সে সকল বিষয়ের উপর গবেষণাকে নিরুৎসাহিত করে। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন একাডেমিক প্রকাশনার জন্যেও সরকারের অনুমোদন ও যাচাই- বাছাই প্রয়োজন।

খ. শান্তিপূর্ণ সভা- সমাবেশ এবং সংগঠণের স্বাধীনতা

সরকার শান্তিপূর্ণ সভা- সমাবেশ এবং সংগঠণের স্বাধীনতা সীমিত বা সীমাবদ্ধ করেছে।

শান্তিপূর্ণ সভা- সমাবেশের স্বাধীনতা

আইন শান্তিপূর্ণ সভা- সমাবেশের অধিকার দেয়। তবে সরকার এই অধিকারকে আরও সীমাবদ্ধ করে। আইন চার ব্যক্তির অধিক সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়। তবে এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কারণ সরকারকে ব্যাপক বিচক্ষণতার সাথে যাচাই করতে হয়। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য সরকারের অগ্রিম অনুমতির প্রয়োজন হয়।

বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, কর্তৃপক্ষ বিরোধী দলের সমাবেশ ও আন্দোলন পরতিহত করতে অনুমোদনের বিধানগুলো ব্যাবহার করে। পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন অনুমতি পাওয়ার জন্য অযৌক্তিক কিছু শর্ত মেনে চলতে হয়। মাঝে মধ্যে পুলিশ বা ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভকে পন্ড করার লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ করে।

সরকার এ বছর কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপপূর্বক দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে সারাদেশে রাজনৈতিক সমাবেশ করার অনুমতি দেয়। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ অনুষ্ঠানের ঠিক পূর্বে সন্ধ্যায় বিএনপিকে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়। কিন্তু শর্ত ছিল যে এই সমাবেশ শুরুর পূর্বে অনুমতিপত্রটি ফটোকপি করে সমাবেশে অংশগ্রহণকারী সকলের কাছে অর্থাৎ আনুমানিক প্রায় ১০০,০০০- ২০০,০০০ অংশগ্রহণকারীর হাতে হাতে দিতে হবে।

সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহীতে বিএনপির এক সমাবেশ থেকে তাৎক্ষনিকভাবে প্রায় ৮০ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিএনপির নেতাকর্মীরা অভিযোগ করে যে রাজশাহী মহানগর পুলিশ (আরএমপি) সমাবেশ দুর্বল করার জন্য দলীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে। রাজশাহী মহানগর পুলিশ (আরএমপি) জানায়, মাদকদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করার অপরাধে একই সময়সীমার মধ্যে প্রায় ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এই গ্রেপ্তার কার্যক্রম কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়নি।

পুরো বছর জুড়ে নানা বিক্ষোভ বা আন্দোলনে বাধা দিতে পুলিশ বল প্রয়োগ করে। জুলাইয়ে বাম গণতান্ত্রিক জোটের (এলডিএ) নেতৃত্বাধীন নেতাকর্মীরা প্রস্তাবিত গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সভা- সমাবেশ করে। দৈনিক নিউ এজ পত্রিকার এক প্রতিবেদনে জানা যায়, পুলিশের বসানো সমাবেশের পথের কাঁটাতারের ব্যাড়াগুলো বিক্ষোভকারীরা সরাতে গেলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ২৫ বিক্ষোভকারী আহত হয়।

সমিতি বা সংগঠনের স্বাধীনতা

আইন নাগরিকদের নৈতিকতা বা জনগণের শৃঙ্খলার স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ" সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠণ গঠনের অধিকার দেয় এবং সরকার সাধারণত এই অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। সরকারের এনজিও বিষয়ক দপ্তর মাঝে মাঝে যে বেসরকারী সংস্থাগুলো সংবেদনশীল বলে বিবেচিত অঞ্চলগুলোতে মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, আদিবাসী অধিকার বা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক সহায়তার কাজ করে এমন বেসরকারী সংস্থাগুলোর বিদেশী অর্থায়নের অনুমোদন আটকে দেয়। (অনুচ্ছেদ ২.ঘ.,৫, এবং ৭.ক দ্রষ্টব্য।

২০১৬ সালের বিদেশী অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী ক্রিয়াকলাপ) ব্যাবস্থাপনা আইনের মাধ্যমে বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও বা সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা বিদেশী তহবিল প্রাপ্তির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এছাড়াও এ আইন সংবিধান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে কোন এনজিও অবমাননাকর মন্তব্য করলে তার শাস্তির বিধান রাখে (৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আগস্ট মাসে, বিদেশি অর্থায়নে চলা কিছু ত্রাণ সংস্থা সহ বেশ কয়েকটি এনজিও ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা সঙ্কটের দুই বছর পূর্তির স্মরণে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার পর সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী সেই সকল সংস্থাগুলোকে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে আর কাজ করার অনুমতি দেয়া হয় নি (৫ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

গ. ধর্মীয় স্বাধীনতা

পররাষ্ট্র দফতরের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদনটি দেখতে নিচের লিংকটি পরিদর্শন করুন।

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/

ঘ. চলাফেরার স্বাধীনতা

এ আইনটি নাগরীকদের দেশের অভ্যন্তরীণ চলাচল, বিদেশ ভ্রমণ, দেশত্যাগ এবং প্রত্যাবর্তনের স্বাধীনতা দেয়। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শিবিরের মত সংবেদনশীল অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতার ব্যাতীক্রম রয়েছে। সরকার বিদেশীদের চট্টগ্রাম বা সিএইচটিতে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

দেশের অভ্যন্তরীণ চলাচল: সরকার ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের প্রোটোকলের কোন পক্ষপাতী নয়। ফলস্বরূপ, সরকারের দাবি অনুসারে এই দলিলের অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারগুলো বহাল রাখার আইনী বাধ্যবাধকতা নেই।

সরকার নতুন করে আগত রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি, বরঞ্চ রোহিঙ্গা শরনার্থী বলার পরিবর্তে তাদেরকে "জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক" বলে উল্লেখ করা হয়। তবে বাস্তবে শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের যে সকল প্রতিষ্ঠিত মান ঠিক করা আছে সরকার সে সকল মান মেনে চলে। এর মধ্যে একটি ব্যাতিক্রম হল রোহিঙ্গা শরনার্থীরা সারা দেশে চলাচল করার পূর্ণ স্বাধীনতা পায় না। তবে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায় বৃহত্তরভাবে অবাধ চলাচল করতে পারে। এছাড়ও শরণার্থীরা যাতে উখিয়া বা টেকনাফের বাইরে চলাচল করতে না পারে সেজন্য সরকার বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট স্থাপন করে।

বিদেশ ভ্রমন: কিছু কিছু প্রবীণ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি দেশ ছাড়ার সময় বিমানবন্দরে হয়রানির স্বীকার হয়েছেন। এছাড়াও বিমানবন্দরে অত্যাধিক বিলম্বের কথাও তারা জানিয়েছেন। সরকার একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদেরকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় না। সরকারী নীতি অনুযায়ী দেশের পাসপোর্ট শুধুমাত্র ইসরাইল ব্যাতিত পৃথিবীর অন্য যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য বৈধ বলে গণ্য হবে।

ঙ. অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ

১৯৭৩ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত চলাকালীন সশস্ত্র সংঘাতের ফলে আরোপিত সরকারী নীতিমালার ফলস্বরূপ চট্টগ্রামে সামাজিক উত্তেজনা ও আদিবাসীদের প্রান্তিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে। এই নীতিমালার ফলে প্রচুর ভূমিহীন বাঙালীদের চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করার লক্ষ্যে প্রায় দশ হাজার আদিবাসীদের স্থানচ্যুতির মাধ্যমে জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলে দেয়া হয়।

চট্টগ্রাম বা সিএইচটি-তে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (আইডিপি) শারীরিক সুরক্ষা খুবই সীমাবদ্ধ। আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতারা দাবি করেন যে বাঙালী বসতী স্থাপনকারীদের দ্বারা তাদের অধিকার ব্যাপকভাবে লঙিঘত হচ্ছে। এছাড়াও কখনও কখনও এ ধরণের কর্মকান্ডতে সুরক্ষা বাহিনীরও সমর্থন থাকে।

চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের পক্ষ হতে কমিশন প্রধাণের একচেঠিয়া কর্তৃত্ব হ্রাস করার উদ্দ্যেশে ২০১৬ সালে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করে। সংশোধিত আইনটি সে বছরের মধ্যে বিরোধসমূহ সমাধা করতে ব্যর্থ হয়। উপজাতী নেতারা এই বিরোধের সমাধানের জন্য এবং আইনটিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার উদ্দ্যেশে একটি উপযোগী পরিচালন কাঠামো গঠণের জন্য জোর সুপারিশ করে। ২০১৭ সালে সরকার বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হককে তিন বছর মেয়াদে কমিশনের সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়। ভূমি মন্ত্রনালয় আইনটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করে, তবে বছরের শেষ অবধি বিধিমালা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা করা হয়নি।

চট্টগ্রাম বা সিএইচটি-তে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত (আইডিপি) ব্যাক্তিদের সংখ্যা বিতর্কিত রয়ে গেছে। ২০০০ সালের একটি সরকারী টাস্ক ফোর্সের অনুমান অনুসারে চট্টগ্রামে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫০০,০০০। এই সংখ্যার মধ্যে স্বাধারণ বাস্তুচ্যুত মানুষ ও আদিবাসীরাও অন্তর্ভুক্ত। সিএইচটি কমিশনের ধারনা অনুযায়ী সম্প্রতি প্রায় ৯০,০০০- এরও বেশি আদিবাসী আইডিপি চট্টগ্রামে বসবাস করছে। প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামে অসামান্য জমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রধানমন্ত্রী অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনগণদের তাদের নিজেদের স্থানে ফিরে যাওয়ার এনং সেখানকার অবশিষ্ট সামরিক ঘাঁটিগুলো সরিয়ে ফেলারও প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ওখানকার কিছু বসতী স্থাপনকারীদের মধ্যে বিরোধের কারণে টাস্ক ফোর্স কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। পরবর্তীতে কমিশন জানায় যে সীমান্তরক্ষীদের ঘাঁটি এবং সেনাবাহিনীর বিনোদনের খাতিরে আদিবাসী পরিবারগুলোকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। এ বছরের মধ্যে কোন জমির বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি।

চ. শরণার্থীদের নিরাপত্তা

২০১৭ সালে আগস্ট মাসে রোহিঙ্গাদের গণহারে এদেশে আসা শুরু হলে সরকার এবং জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক দপ্তর (ইউএনএইচসিআর) – এর হাই কমিশনার, কুতুপালং এবং নয়াপাড়া নামক দুটি সরকারী ক্যাম্পে বসবাসরত প্রায় ৩৩,০০০ নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অস্থায়ী সুরক্ষা এবং প্রাথমিক সহায়তা প্রদান করে। একই সাথে সরকার এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) কক্সবাজারের অস্থায়ী বসতিগুলোতে বসবাসরত প্রায় দুই লক্ষ অনথিভুক্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দিয়েছে। বার্মা বা মিয়ানমারের জাতিগত নির্মূলকরণের বর্বর অভিযানের ফলশ্রুতিতে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে ৭০০,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পালিয়ে আসে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীদের আগমণের ফলস্বরুপ, রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবির, অস্থায়ী শিবিরসহ বিভিন্ন অতিথিশালায় প্রায় দশ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা বসবাস করছে। জাতিসংঘের ধারনা মতে রোহিঙ্গা শিবিরে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি মানুষের বয়স ১৮ বছরের কম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স সামগ্রিক রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশ দুর্যোগ ও ত্রান বিষয়ক মন্ত্রনালয় রোহিঙ্গা পরিস্থিতিকে সামাল দিচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার এব্যাপারে সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

বেসামরিক প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রাণ কার্যক্রমকে সহজতর করার উদ্দ্যেশে এবং রোহিঙ্গাদের নিবন্ধনে সকল ধরণের সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালের শুরুর দিকে কক্সবাজার জেলায় সাময়িকভাবে সেনা মোতায়েন করে। কক্সবাজার জেলার রোহিঙ্গা শিবিরে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা ঝুকির ফলশ্রুতিতে সামরিক বাহিনী আরও তৎপর হয়ে ওঠে। সেপ্টেম্বর মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০১৭ সাল থেকে পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ নিরাপত্তা প্রদানের খাতিরে যেসকল দায়িত্ব পালন করছিল, সে সকল নিরাপত্তা সম্পর্কিত দায়িত্ব এখন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পালন করবে। একই মাসে সরকার কক্সবাজার জেলার বেশ কিছু স্থানে টেলিযোগাযোগ পরিষেবার উপর নানা নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই পদক্ষেপের ফলে রোহিঙ্গা শিবিরসমূহ সহ তার আশেপাশের স্থানগুলোতে মোবাইল এবং ইন্টারনেট পরিষেবা সীমিত করা হয়। ফলে বিভিন্ন ধরণের সহিংসতা বা নির্যাতনের খবর দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাবহৃত সুরক্ষা হটলাইনের মত জীবন রক্ষাকারী বেশ কিছু পরিষেবার কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।

অভিবাসী, শরণার্থী এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের অপব্যবহার: রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা ও সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতীসংঘের শ্ররণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এবং অন্যান্য মানবিক সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করেছে। আগস্ট মাসে আইওএম (IOM), রোহিঙ্গা শিবিরগুলো থেকে ৯৬ জন রোহিঙ্গাকে শনাক্ত করে যাদেরকে প্রধানত শ্রমিক হিসেবে পাচার করা হচ্ছিল। ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগই ছিল নারী ও মেয়ে শিশু। এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে রোহিঙ্গা পুরুষদের মধ্যে অনেকে তাদের নিজেদের পরিচয় গোপন করে এবং তারা কোন পরিষেবাও চায় নি। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে জানাজানি হলে সরকারী কর্মকর্তারা পাচারের শিকার ব্যাক্তিদের রোহিঙ্গা শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো শিবিরগুলোতে নারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধির খবর জানিয়ে উদ্দ্যেগ প্রকাশ করে। এই সকল সহিংসতার সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ভাগই ঘটনাই হয়ে থাকে তাদের অন্তরঙ্গ সাথীদের সাথে। রোহিঙ্গা পুরুষদের জীবিকা ও শিক্ষার সুযোগের অভাব অব্যাহত থাকলে এই ধরণের সহিংসতার সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেয় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো।

মানব পাচার সহ সকল ধরণের অপরাধের জবাবদিহিতা একটি সমস্যা হিসেবে থেকে গেছে। রোহিঙ্গারা অপরাধের অভিযোগ ও তার সমাধানের জন্য প্রতিটি শিবিরের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকা সরকারি কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর করে (এরা ক্যাম্প ইন চার্জ বা সিআইসি নামেও পরিচিত)। শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সিআইসিগণ সাধারণত স্বায়ত্বশাসিতভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং শিবিরের বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের কর্মকান্ড বেশ বৈচিত্রময়। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতে, কিছু কিছু সিআইসিগণ দুর্নীতি সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অভিযোগ করেছে যে কিছু সীমান্তরক্ষী, সামরিক এবং পুলিশ বাহিনীর ব্যাক্তিগণ রোহিঙ্গা নারী ও শিশু পাচারের সাথে জড়িত রয়েছে। মানব পাচারকারীদের থেকে ঘুষ গ্রহণ করে তাদেরকে রোহিঙ্গা শিবিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা পাচারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে।

জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন: জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (UNHCR) জানিয়েছে, সরকার সম্ভাব্য প্রত্যবাসনের ঘটনায় সেপ্টেম্বর মাসে ছয় রোহিঙ্গাকে বার্মায় বা মায়ানমারে ফেরত পাঠায়। এছাড়া আর কোন জোরপূর্বক প্রত্যবাসনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নেই। যে সকল রোহিঙ্গা বার্মায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তাদের বার্মায় পরিবহনের জন্য ২২ শে আগস্ট কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা শিবিরগুলিতে বাস পাঠায়। কোন শরণার্থীই যখন বার্মায় ফেরত যেতে রাজি হল না তখন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগটি বন্ধ করে দেয়। সরকার রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়। বছরের বেশ কিছু সময় উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাগণ রোহিঙ্গাদের সম্মতির ভিত্তিতে তাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ এবং স্থায়ী প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি রাখার চেষ্টা করেন। ২রা সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন।

আশ্রয়স্থানে প্রবেশ: শরনার্থীদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠিত কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাবস্থা নেই। এছাড়াও আইনে শরনার্থীদের নিরাপদ আশ্রয় বা শরণার্থী মর্যাদা দেয়ার বিধান নেই। কিন্তু সরকার রোহিঙ্গা শরনার্থীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা এবং সহায়তা প্রদান করেছে। সরকার রোহিঙ্গাদের দুটি সরকারি শিবিরে নিবন্ধিত শরণার্থীদের অস্থায়ী সুরক্ষা এবং প্রাথমিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরকে সহযোগিতা করে আসছে। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমনের পরে সরকার নতুন শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন শুরু করে এবং তাদের বার্মিজ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক পরিচয়পত্র সরবরাহ করে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চিহ্নিত করতে এবং বার্মায় জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে সরকারের প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা প্রদানের জন্য সরকার পূর্ববর্তী পরিচয়পত্রকে প্রতিস্থাপন করে নতুন পরিচয়পত্র সরবরাহ করে। এ কাজে সরকার ও ইউএনএইচসিআর যৌথভাবে কাজ করছে। এই পরিচয়পত্র ব্যাবস্থা থাকা সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের আনুষ্ঠানিক শরণার্থী মর্যাদার অভাব রয়েছে। সেই সাথে শিবিরগুলোতে সুস্পষ্ট আইনী প্রতিবেদন ব্যাবস্থা না থাকায় শরণার্থীরা ন্যায়বিচারের সুবিধা পাচ্ছে না। ফলশ্রুতুতে রোহিঙ্গাদের অপব্যাবহার ও শোষণের ঘটনাগুলো কর্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে এবং পাচারকারীসহ অন্যান্য দুষ্টচক্র এর সুযোগ নিচ্ছে।

চলাফেরার স্বাধীনতা: কক্সবাজার জেলার রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে শরণার্থীদের চলাফেরার স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের মধ্যে করা ১৯৯৩ সালের সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুটি শরণার্থী শিবিরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গাদের আগমনের পর পরই পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় চেকপোস্ট বা পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করে যাতে নতুন আগত ও পূর্বে নিবন্ধিত শরণার্থীদের উভয়েই উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার বাইরে যেতে না পারে। নভেম্বরে সরকার শিবিরটিকে আরও সুরক্ষিত করার উদ্দ্যেশে এবং রোহিঙ্গাদেরকে পাচার ও চোরাচালান থেকে রক্ষা করার জন্য বেড়া তৈরির কার্যক্রম শুরু করে। রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে সহিংস হামলা, অপহরণ, বা এ ধরণের অসদ কর্মকান্ড প্রতিহত করার উদ্দ্যেশে শিবির কর্তৃপক্ষ বিশেষত রাতে কারফিউ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহলের প্রবর্তন করে।

কর্মসংস্থান: রোহিঙ্গা শরণার্থীদের স্থানীয়ভাবে কাজ করার জন্য সরকার কোন আনুষ্ঠানিক অনুমতি দেয় নি। তবে সরকার রোহিঙ্গা শিবিরের মধ্যে সীমিত নগদ অর্থের বিনিময়ে শরণার্থীদের কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। তাদের চলাচলে বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু শরণার্থী অনানুষ্ঠানিকভাবে শ্রমিক হিসাবে অর্থনৈতিক কাজকর্ম করছে, যার বেশিরভাগই করছে অবৈধভাবে। এছাড়াও বেশ কিছু শরণার্থী শ্রমিক পাচারের শিকার হচ্ছে।

মৌলিক সেবাসমূহের সুযোগ: জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ফলে নির্ধারিত শিবির এবং অস্থায়ী জনবসতিগুলোর ভিতরে ও বাইরে উভয় জায়গাতেই পরিষেবাগুলো সীমিত আকার লাভ করে। জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন ইন্টার সেক্টর কো-অর্ডিনেশন দল (আইএসসিজি) রোহিঙ্গাদের প্রাথমিক পরিষেবা সরবরাহকারী অনেক প্রতিষ্ঠান এবং এজেন্সিকে সমন্বিত করে। তবুও, আইএসসিজি অনুসারে শরণার্থীরা একরকম জঞ্জালযুক্ত জায়গাগুলোতে বসবাস করে যে জায়গাগুলো বর্ষার বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে সামাল দেয়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত নয়। সংস্থাগুলো শরণার্থীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের আলাদা জায়গায় স্থানান্তর করার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে জমির স্বল্পতা একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রাথমিক পরিষেবা লাভে বাধা সৃষ্টি করছে।

শরণার্থী শিবিরে জনশিক্ষা একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। সরকার নীতিমালা অনুসারে রোহিঙ্গা শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা রন্ধ রেখেছে। তবে, সরকার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার অনুমতি দিয়েছে। ইউনিসেফ রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে একটি বিস্তর শিক্ষা পদ্ধতি বিকাশের উদ্দ্যেশে বিভিন্ন মানবিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিকনির্দেশনা প্রদান করার মাধ্যমে শিবিরের শিক্ষা ব্যাবস্থায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রথমিক শিক্ষা ব্যাবস্থা একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশী বা বার্মিজ সরকার কর্তৃক শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর অনুযায়ী রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি বা প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয় না। যাহোক, রহিমা আক্তার নামে একজন রোহিঙ্গা মহিলা আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি তার পরিচয় গোপন রাখেন। ২০১৮ সালের অক্টোবরে স্থানীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে রহিমা আক্তারকে তুলে ধরা হয়। সে প্রতিবেদনে রহিমা মানবাধিকার নিয়ে তার পড়াশোনার ইচ্ছা এবং স্বপ্নের কথা বলেন। পরবর্তীতে প্রতিবেদনের ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায়। সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে রোহিঙ্গা হওয়ার দায়ে বহিষ্কার করে।

সরকারী কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত উভয় ধরণের রোহিঙ্গাদেরকেই নিয়মিত এবং আনুষ্ঠানিক জনস্বাস্থ্য সেবার সুযোগ দিচ্ছে। তবে রোহিঙ্গাদের শিবির থেকে বের হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়। মানবতাবাদী সংস্থাগুলো রোহিঙ্গাদের চিকিৎসার ব্যায়ভার বহণপূর্বক চিকিৎসা শেষে তাদের নিজস্ব শিবিরে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করে। স্বাস্থ্য খাত রোহিঙ্গা শিবির এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রাপ্য তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় সামগ্রিক কর্মকান্ড কেবলমাত্র শিবিরের নূন্যতম প্রয়োজনীয়তা মেটায়।

ছ. রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিসমূহ

দেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আইন অনুযায়ী অথবা বাস্তবে রাষ্ট্রহীন ছিল। তারা নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেনি বা বার্মার সরকার তাদেরকে নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নি।

বাংলাদেশে বিহারীদের নামে পরিচিত উর্দু-ভাষী জনসংখ্যা মূলত উর্দুভাষী মুসলমান যারা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে গিয়েছিল।প্রায় ৩০০,০০০ উর্দুভাষী বিহারী জনগোষ্ঠী পূর্বে রাষ্ট্রহীন ছিল কিন্তু ২০০৮ সালের একটি আদালতের মামলার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশী নাগরিকত্ব পায়। এ মামলা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল আইন ও প্রশাসনিক আবশ্যিক শর্ত পূরণকারী প্রতিটি সদস্যকে নির্বাচন কমিশন জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করবে। তবুও বিহারী জনগোষ্ঠীর সদস্যাগণ অভিযোগ করে যে তাদের ঠিকানার জন্য ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা পাসপোর্টের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে থাকে। এই জনসংখ্যার সিংহভাগ এখনও সত্তরের দশকে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ফর রেড ক্রস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শরণার্থীদের শিবিরের মত জায়গায় বসবাস করছে, যেখন অনেকে বিশ্বাস করেছিল যে তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে পাকিস্তানে ফিরে যাবে।

অনুচ্ছেদ ৩. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতা

সংবিধান নাগরিকদের গোপন ব্যালট দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করে।

নির্বাচন এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ

সাম্প্রতিক নির্বাচনসমূহ: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবারের ডিসেম্বরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবিচ্ছিন্নভাবে পর পর তৃতীয়বারের মত পাঁচ বছর মেদায়ী ক্ষমতায় আসেন। এই নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে গণ্য করা হয় না। কারণ নির্বাচন চলাকালে ব্যালট বাক্সে জাল ভোট দেয়া এবং বিরোধী পোলিং এজেন্ট ও ভোটারদের ভয় দেখানোসহ নানা রকম অনিয়ম এ নির্বাচনে লক্ষ্য করা যায়। প্রায় ৯৬ শতাংশ ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ ও তার নির্বাচনী সহযোগীরা সরাসরি নির্বাচিত ৩০০ আসনের ২৮৮ টিতে জয়লাভ করে, এবং প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও তার নির্বাচনী সহযোগীরা সর্বসাকুল্যে মাত্র সাতটি আসনে জয়লাভ করে। নবগঠিত সংসদ বর্জনের প্রাথমিক ঘোষণা সত্ত্বেও মির্জা ফখরুল ব্যাতীত অন্যান্য বিএনপির সংসদ সদস্যরা ২৯ শে এপ্রিলের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগদান করেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এটিকে অবৈধ বলে অভিহিত করেন। সংসদে ২২ সদস্য বিশিষ্ট আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন শাসক জোটের একটি অংশ বাংলাদেশ জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দলের সরকারী মর্যাদা দেওয়া হয়। নির্বাচনের প্রচারনার সময় হয়রানি, হুমকি, নির্বিচারে গ্রেপ্তার কার্যক্রমসহ নানা রকম সহিংসতার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন পাওয়া যায়। এ ধরণের সহিংসতা ও

বাধা বিপত্তির কারণে বিরোধী দলীয় প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের সভা- সমাবেশ এবং অবাধ প্রচারকার্য চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার উদ্দ্যেশে এশিয়ান নেটওয়ার্ক থেকে একটি নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদল তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সরকার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দলকে স্বীকৃতি ও ভিসা প্রদান করে নি। সেইসাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক দপ্তর এবং নির্বাচন কমিশন দেশীয় জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রায় ২২ টি বেসরকারি নির্বাচনী কার্যকরী সংস্থার (এনজিও) মধ্যে মাত্র ৭ টি সংস্থাকে অনুমতি দেয়।

১১ ই মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০ বছরেরও বেশি সময় পর প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন তথা ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রায় ৪৭,০০০ শিক্ষার্থী ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে যে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে ব্যালট বাক্স ভরে নির্বাচনটি পন্ড করে।

রাজনৈতিক দল এবং তাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: সরকার বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি অভিযোগ আনার উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে সংঘবদ্ধ করে। ২০০৮ সালে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দায়ের করা দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র নেতা খালেদা জিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাবন্দি করা হয়। সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিএনপি নেতা বেগম খালেদা জিয়ার বিরূদ্ধে প্রায় দুই ডজনেরও বেশি অভিযোগ দায়ের করে। ফলে তার পক্ষে মামলায় আপিলের বিচারাধীন জামিন পাওয়া সম্ভব হয় নি। বিএনপি অভিযোগ করে যে ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে পুলিশ বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করে এবং অভিযুক্ত অনেক নেতাকর্মীকে আটক করে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলো দাবি করে যে এই মামলাগুলোর মধ্যে অনেক গুলোই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল।

সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীরা নানা ফৌজদারি মামলার মুখোমুখি হয়ে থাকে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক হয়রানির কারণে দেশের বৃহত্তম ইসলামী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর (জামায়াত) নেতারা তাদের সংবিধানিক বাক স্বাধীনতা ও সমাবেশের স্বাধীনতার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে না। সরকার জামায়াতে ইসলামী (জামায়াত)-কে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের তালিকা থেকে সরিয়ে নেয়। অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে কোন পদপ্রার্থী হতে পারবে না। এছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী ও সদস্যদের সভা- সমাবেশের আয়োজন এবং বক্তিতা প্রদানের মত মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারগুলোকে অস্বীকার করা হয়। যে সকল গণমাধ্যমগুলো সরকার এবং ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের বিপক্ষে সমালোচনা করে, সে সকল গণমাধ্যমগুলোকে বিজ্ঞাপনের অর্থ হ্রাস করা সহ নানা হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। সরকারের এরূপ বিরুপ আচরণ থেকে রেহায় পেতে গণমাধ্যমগুলো তাদের নিজেদের প্রতিবেদনগুলো পুনঃবিবেচনা করা শুরু করে। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ ছাত্র লীগ (বিসিএল) বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের হুমকি দেয়া থেকে শুরু করে সারা দেশ জুড়ে নানা রকম সহিংস কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৭ই অক্টোবর, জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন শিবিরের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ রাব্বিকে পিটিয়ে হত্যা করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠণ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কর্মীরা। এছাড়াও ভারতের সাথে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সমালোচনা করা বেশ কয়েকটি ফেসবুক পোস্ট প্রদানের অভিযোগ আসে নিহত বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের উপর। একজন মেডিকেল পরীক্ষক পরীক্ষা করে জানান যে অবিরত ক্রিকেট স্ট্যাম্পের আঘাত ও মারধোরের কারণে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ এবং ব্যাথার ফলে আবরার ফাহাদ রাব্বির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরবর্তী দিনগুলোতে কর্তৃপক্ষ ফাহাদের মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত বুয়েট ছাত্রলীগের নেতাকর্মীসহ ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। ছাত্রলীগের এক নেতা অন্য ছাত্রলীগের নেতাদের সাথে নিয়ে ফাহাদকে মারধর করার কথা স্বীকার করে। এই ঘটনার পর সারা দেশ ব্যাপি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়। রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকা ছাত্র সংঘটনের নানা রকম সহিংসতার বিরূদ্ধে দেশের নাগরিক সমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবরার ফাহাদের হত্যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১১ ই অক্টোবর বুয়েটের উপাচার্য বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ছাত্র সংগঠনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৩ই নভেম্বর, পুলিশ আবরার ফাহাদকে হত্যার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত করে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করে।

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরুদ্ধে সরকারের দায়ের করা ৮৬ টি ফৌজদারি মামলার এখনও পর্যন্ত কোন নিষ্পত্তি হয়নি। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জামিনে মুক্তি পেয়ে আছেন। এই অভিযোগসমূহের মধ্যে পুলিশের উপর হামলা, বাস পোড়ানো ও বোমা নিক্ষেপের সাথে জড়িত থাকা সহ আরও নানা অভিযোগ উল্লেখযোগ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সরকার বিরোধী দলগুলোর জনসভা করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে এবং বিরোধী দলীয় নানা অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। পূর্ববর্তী বছরগুলোর ব্যাতিক্রমস্বরূপ, কারাগারে থাকা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে বিএনপিকে বেশ কয়েকটি সমাবেশ ও মানববন্ধন করার সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা দিয়েছিল সরকার।

নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ: কোন আইন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারী বা সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা রাখে না। বাস্তবেও নারী বা সংখ্যালঘুরা নানা রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে সংসদ সংবিধান সংশোধন করে নারীদের জন্য সংসদে ৫০ টি সংরক্ষিত আসলের বিধান আরও ২৫ বছর বেশি বাড়ানো। এই নারী সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্যের সরাসরি ভোটে মনোনীত হন। নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো দলগুলোর মধ্যে তাদের সংসদীয় প্রতিনিধির সংখ্যার সাথে আনুপাতিকভাবে বিতরণ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ৪. সরকারের স্বচ্ছতার অভাব ও দুর্নীতি

দুর্নীতির অভিযোগ আসলে আইন নির্ধারিত কর্মকর্তাদের দ্বারা ফৌজদারি জরিমানার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সরকার প্রকৃতভাবে আইনটি কার্যকর করেনি এবং কর্মকর্তারা প্রায়শই কোন রকম সাজা ছাড়াই দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হন।

দুর্নীতি: দুর্নীতি একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে স্থায়িত্ব পেয়েছে। জুলাই মাসে দুর্নীতি দমন কমিশনের সভাপতি বলেন যে দুদকের উপর জনগণের আস্থা কমে গেছে। কারণ দুদকের তদন্তসমূহ কেবল ক্ষুদ্র দুর্নীতির ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদকের নেতৃত্ব পর্যায়েও দুর্নীতির সন্দেহ রয়েছে। জুলাই মাসে, দুদকের প্রাক্তন পরিচালক খন্দকার এনামুল বসিরকে শীর্ষস্থানীয় পুলিশ উপ-মহাপরিদর্শক মিজানুর রহম্ানের সাথে জড়িত দুর্নীতির মামলায় ঘুষের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দুর্নীতি দমন কমিশনের এক অনুসন্ধানে দেখা যায় মিজানুর রহমান ১৯৯৮ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ৪.৬৩ কোটি বাংলাদেশী টাকা উপার্জন করেন যা প্রায় ৫৫০,০০০ মার্কিন ডলারের সমান। এই এত বড় অংকের উপার্জনের মধ্যে কেবল ১.৩৩ কোটি বাংলাদেশী টাকা (১৬০,০০০ মার্কিন ডলার) এসেছে বৈধ উৎস থেকে। দুর্নীতির অভিযোগ সরিয়ে নেয়ার উদ্দ্যেশে খন্দকার এনামুল বসিরকে মিজানুর রহমান ঘুষ প্রদান করেছেন বলে দাবি করেন। পরবর্তীতে এ অভিযোগের ফলশ্রুতিতে এনামুল বসিরকে দুদক থেকে অপসারণ করা হয় এবং পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০১৮ সালের আগস্ট মাসে সংসদে একটি আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী আদালত কর্তৃক অভিযোগ গঠনের পূর্বে এবং সরকারের অনুমতি ব্যাতিত দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কোন সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। সুশাসন ও স্বচ্ছতার পক্ষপাতি এবং প্রচারকারীরা এই বিধানটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। তাদের মতে এই বিধানটি দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যাবহার করা হবে।

সরকার তার কমিউনিটি-পুলিশি কার্যক্রমটি ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারণ করে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাপক পুলিশি দুর্নীতি মোকাবেলার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অর্থনৈতিক উন্মোচন: আইন অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশনের কাছে তাদের নিজ নিজ ব্যাক্তিগত সম্পদের বিবৃতি দাখিল করতে হয়। আইনে কর্মকর্তাদের দ্বারা আয়ের এবং সম্পদের পরিমাণ প্রকাশের প্রয়োজন নেই।

অনুচ্ছেদ ৫. মানবাধিকারক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও বেসরকারী তদন্তের ব্যাপারে সরকারী মনোভাব

বেশ কয়েকটি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সাধারণত কিছু সরকারী বিধিনিষেধ মেনে তদন্ত করে এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘটনার উপর তাদের ফলাফল প্রকাশ করে। সরকারী কর্মকর্তাগণ তাদের মতামত ও বিভিন্ন সাহায্য সহযোগীতার ব্যাপারে খুবই কম সহযোগিতামূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল ছিল।

যদিও মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো প্রায়শই সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। তবে এই সমালোচনার মধ্যেও কিছু স্ব-সেন্সরশিপের অনুশীলন লক্ষ করা যায়। চরমপন্থীদের হুমকি এবং ক্রমবর্ধমান নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক দল দ্বারা নাগরিক সমাজের কার্যকারিতা হ্রাস এবং এর পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটার ব্যাপারে সরকারের কৌশল সম্পর্কে পর্যবেক্ষকরা নানা রকম মন্তব্য করেন। এমনকি ক্ষমতাসীন দলের সাথে যুক্ত সুশীল সমাজের সদস্যরাও জনসমক্ষে সরকারের

নীতিমালার সমালোচনা করার জন্য সুরক্ষা বাহিনীর কাছ থেকে গ্রেপ্তারের হুমকি পাওয়ার কথা জানায়।

সরকার মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' এর তহবিল ও পরিচালনার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। সরকারী কর্মকর্তা এবং সুরক্ষা বাহিনী কর্তৃক নানা রকম হয়রানির অভিযোগ আনে বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার'। তাদের পরিকল্পিত অনুষ্ঠানের নানা কর্মকান্ডে বাঁধা প্রদান করা এবং বছরের শেষের দিকে ইচ্ছাকৃত তহবিলের সীমাবদ্ধতা আনা সহ নানা রকম হয়রানির অভিযোগ এখানে উল্লেখযোগ্য।

১৪ নভেম্বর স্থানীয় এক ভ্রাম্যমাণ আদালত ম্যাজিস্ট্রেট মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (এএসকে)- কে দুই মাসের মধ্যে এটির ঢাকার প্রধান কার্যালয় ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। এছাড়া আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা আইনত নিষদ্ধ। এ আইন লঙঘন করার দায়ে ম্যাজিস্ট্রেট মানবাধিকার সংস্থাটিকে ২০০,০০০ বাংলাদেশী টাকা বা ২,৪০০ মার্কিন ডলার জরিমানা করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (এএসকে)- এর নির্বাহী পরিচালক শিপা হাফিজা আদেশটিকে "অবৈধ" বলে অভিহিত করেন। তিনি সাংবাদিকদের অভিহিত করেন যে সংস্থাটির অপরাধের জন্য আনা অভিযোগ খণ্ডনের জন্য আইন ও সালিশ কেন্দ্র (এএসকে) বিষয়টি আদালতে প্রেরণ করবে। শিপা হাফিজা আরও বলেন যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ "মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত করবে"।

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ধর্মীয় সংস্থাগুলো সহ সকল বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) সমূহ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত থাকতে হবে। ধর্মীয় বিষয়, মানবাধিকার, আদিবাসী সম্প্রদায়, এলজিবিটিআই সম্প্রদায়, রোহিঙ্গা শরণার্থী বা শ্রমিক অধিকার উভয়ের মতো সংবেদনশীল বিষয় বা গোষ্ঠীগুলো নিয়ে কাজ করা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) গুলো আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয় ধরণের সরকারী বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের তদারকি করে করে বলে কিছু কিছু গোষ্ঠী বা সংস্থা দাবি করে। সরকার কখনও কখনও আন্তর্জাতিক এনজিও গুলোর প্রকল্পের নিবন্ধনে বাঁধা সৃষ্টি করে বা অনুমোদনের সময়কাল পিছিয়ে দেয়। অথবা নানা রকম নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ ভিসা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক বিলম্বের সৃষ্টি করে। এ সকল কারণে সংস্থাগুলোর পরিচালনা কার্যক্রম সীমিত আকার লাভ করে।

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী দেশে প্রবেশের ফলে অসংখ্য বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও দেশে প্রবেশ করেছে। ২৫ শে আগস্ট রোহিঙ্গা সঙ্কটের দুই বছর পূর্তির কারণে বেশ কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা শান্তিপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করে। পরবর্তীতে সরকারের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক দপ্তর কক্সবাজারের কয়েকটি এনজিওর উপর বিধিনিষেধ ও সাসপেনশন আরোপ করে (অনুচ্ছেদ ২.খ. দ্রষ্টব্য) । সরকার এই সমস্ত এনজিও গুলোর নাম জনসম্মুখে অথবা গণমাধ্যমে প্রকাশ করেনি।

২০১৬ সালের বিদেশী অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী ক্রিয়াকলাপ) ব্যাবস্থাপনা আইনের মাধ্যমে বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও বা সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা বিদেশী তহবিল প্রাপ্তির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এছাড়াও এ আইন সংবিধান বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (যা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী প্রতিষ্ঠান) সম্পর্কে কোন এনজিও অবমাননাকর মন্তব্য

করলে তার শাস্তির বিধান রাখে।

জাতিসংঘ বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা: জাতিসংঘের একটি কার্যনির্বাহী দল বলপূর্বক গুমের ব্যাপারে তদারকি করার উদ্দ্যেশে দেশে আসার অনুমতি চাইলে সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায় নি। বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের কার্যালয় থেকে বাংলাদেশে তদন্ত করার উদ্দ্যেশে জাতিসংঘের তদন্তকারীদের জন্য প্রায় ১৫ টি আবেদন ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ করা হয়। এর মধ্যে বিচার বহির্ভূত, সংক্ষিপ্ত বিচার বা নির্বিচারে ফাঁসি সম্পর্কিত বিশেষ দূত; শান্তিপূর্ণ সভা- সমাবেশ এবং সমিতির স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কিত বিশেষ দূত; এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রচার ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ দূত উল্লেখযোগ্য।

সরকারী মানবাধিকার সংস্থাসমূহ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (এনএইচআরসি) পাঁচটি সম্মানসূচক পদ সহ সাত জন সদস্য রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সিনিয়র সচিব নাসিমা বেগমকে সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (এনএইচআরসি) চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এই নিয়োগের সিদ্ধান্ত নাগরিক সমাজে তীব্র সমালোচনার সূচনা করে। নাগরিক সমাজ সরকারের এই বাছাই প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং কমিশনের কার্যকারিতা ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা করে, কারণ কমিশনের সকল সদস্যই ছিল সরকারী আমলা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (এনএইচআরসি) প্রাথমিক কার্যক্রম হল মানবাধিকার লঙঘনের ঘটনাগুলো তদন্ত করা, আইনী বৈষম্য নিরসন করা, জনগণকে মানবাধিকার সম্পর্কে অভিহিত করা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

অনুচ্ছেদ ৬. বৈষম্য, সামাজিক নির্যাতন এবং মানবপাচার

নারী

ধর্ষণ ও পারিবারিক সহিংসতা: আইনে পুরুষের দ্বারা যৌন নির্যাতনের মাধ্যমে স্ত্রী বা অন্য নারীকে ধর্ষণ করা নিষিদ্ধ। তবে এক্ষেত্রে নারীর বয়স ১৩ বছরের বেশি হলে আইন অনুযায়ী বৈবাহিক ধর্ষণের বিষয়টি অগ্রাহ্য হবে। ধর্ষণকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যদণ্ডের মত কঠোর শাস্তি দেওয়া হতে পারে।

বিশ্বাসযোগ্য মানবাধিকার সংস্থাগুলো সম্মত হয় যে বছরের প্রথমার্ধে ধর্ষণের মামলা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পায়। এএসকে, হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি) জানায় যে জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে প্রায় ৬৩০--৭৩৮ জন নারী ধর্ষণের স্বীকার হয়েছে। এই চিত্রটি আগের বছরের একই সময়সীমার চিত্রের চেয়ে তুলনামূলক অনেক বেশি। তুলনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ (বিএমপি)- এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮ সালে মোট ৯৪২ জন নারী ধর্ষিত হয়েছিল।

দোষী ছাড় পেয়ে যায় এমন নানা রকম যৌন সহিংসতার খবর পাওয়া যায়। আগস্ট মাসে কর্তব্যে অবহেলা এবং এক মহিলাকে আটক ও গণধর্ষণের অভিযোগে খুলনা কর্তৃপক্ষ খুলনার সরকারী রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সহ দুজন পুলিশ কর্মকর্তাকে অপসারণ করে। মহিলার

পরিবারের তথ্য অনুসারে, তাকে খুলনার ফুলতলা রেলওয়ে স্টেশনে রেলওয়ে পুলিশ একটি ট্রেনের অভ্যন্তরে আটক করে এবং পরবর্তীতে মহিলাটিকে একটি পুলিশ আবাসিক ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। মহিলাটির পরিবারের ভাষ্যে, খুলনা রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এবং আরও চারজন পুলিশ সদস্য তাকে সেখানে ধর্ষণ করে। মহিলাটির পরিবার তার আটকের বিষয়টি জানতে পেরে থানায় গিয়েছিল। সেখানে পুলিশ তার মুক্তির জন্য ১.৫ লক্ষ বাংলাদেশী টাকা (১,৮০০ মার্কিন ডলার) দাবী করে। পুলিশ মহিলাটির বিরুদ্ধে প্রথমে মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগ আনে এবং পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে মাদকাশক্তির অভিযোগ আনা হয়। জনসমক্ষে এ ব্যাপার জানাজানি হলে ব্যাপক সমালোচনার চাপে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ওসির বিরূদ্ধে টর্চার এন্ড কাস্টোডিয়াল ডেথ (প্রতিরোধ) আইনে মামলা করে।

মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকারীদের মতে, আইনজীবি সেবা, সামাজিক কলঙ্ক এবং সাক্ষী পেশ করার আইনি প্রয়োজনীয়তাসহ আরও নানা হয়রানির আশঙ্কার কারণে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ধর্ষণের খবর দেয় না। ধর্ষণের প্রমাণের জন্য মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে হয়। এছাড়াও ধর্ষণের শিকার ব্যাক্তির উপর সকল বোঝা চাপানো হয়।

২০১৮ সালের এপ্রিলে উচ্চ আদালত ধর্ষণ মামলা পরিচালনা করার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণসহ অন্যান্যদের উদ্দ্যেশে ১৬ দফা নির্দেশিকা প্রকাশ করে। ধর্ষণ মামলার লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার বিলম্বের অভিযোগের পরে ২০১৫ সালের রিট আবেদনের জবাবে এই নির্দেশনাসমূহ এসেছে। নির্দেশিকা অনুসারে, যেকোন থানার ওসি অবশ্যই ঘটনার স্থান কাল নির্বিশেষে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের সাথে সম্পর্কিত যে কোন ধরণের তথ্য রেকর্ড করবে। ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের ঘটনার খবর পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষা ও ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। হাইকোর্টের নির্দেশিকাগুলোতে আরও বলা হয়েছে যে প্রত্যেক থানায় অবশ্যই কর্তব্যরত কর্মকর্তার মাধ্যমে মামলার লিপিবদ্ধকরণের সময় ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার নারীদের জন্য একজন মহিলা পুলিশ অফিসার উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। আইনজীবি, সমাজসেবক, সুরক্ষা কর্মকর্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তির কাছে উপযুক্ত মনে হয় এমন অন্য যে কাউকে তার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার সময় উপস্থিত থাকা দরকার। প্রতিবন্ধী ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনে সরকারী ব্যাখ্যামূলক বা অনুবাদ পরিষেবা সরবরাহ করা উচিত। এছাড়াও প্রয়োজনে তদন্তকারী অফিসারকে একজন মহিলা পুলিশ অফিসারের সহায়তায় ভুক্তভোগীকে মেডিকেল পরীক্ষা করানোর জন্য নিয়ে যেতে হবে।

অন্যান্য ক্ষতিকারক ঐতিহ্যগত অনুশীলনসমূহ: যৌতুক দাবি নিষিদ্ধ করার সাম্প্রতিক আইনী পরিবর্তন সত্ত্বেও কিছু গণমাধ্যম এবং বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) নারীদের উপর যৌতুক সম্পর্কিত বিরোধের সাথে সম্পর্কিত সহিংসতার কথা জানিয়েছে। স্পষ্টতই ১৯৮০ সালের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য সংসদে ২০১৮ সালে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন নতুনভাবে গৃহীত হয়। এই আইন অনুযায়ী, যৌতুক দাবি বা দান উভয়য়ের জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, ৫০,০০০ বাংলাদেশী টাকা (৫৯০ মার্কিন ডলার) জরিমানা জারি করা হয়।

১১ ই সেপ্টেম্বর শোভা রাজমনি হোসনা নামক এক নারী তার স্বামীর যৌতুক সম্পর্কিত চলমান মারধরের ফলে মৃত্যু বরণ করেন। একজন রাজনৈতিক নেতার মেয়ে হোসনা এবং তার পরিবার দাবি করে যে যৌতুকের দাবিতে তার স্বামী তাকে নিয়মিত মারধর করত। তার শরীরে একাধিক

আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেলেও, চিকিৎসকরা তার ঘটনাটিকে আত্মহত্যা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। এ ব্যাপারে মানবাধিকার সম্পর্কিত উকিলগণ তীব্রভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত শোভা রাজমনি হোসনার মৃত্যুর অভিযোগে তার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একটি রায় কেবল ধর্মীয় বিষয় নিষ্পত্তি করার জন্য ফতোয়া (ধর্মীয় নির্দেশ) ব্যবহারের অনুমতি দেয়; ফতোয়া অনুযায়ী শাস্তির বিধানকে ন্যায়সঙ্গত করার আহবান করা যাবে না এবং ফতোয়া কখনই ধর্মনিরপেক্ষ আইনকেও বাতিল করে দিতে পারে না। ইসলামী ঐতিহ্য মোতাবেক কেবল মাত্র যে সকল ধর্মীয় পণ্ডিতদের ইসলামী আইনে যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে তারাই শুধুমাত্র ফতোয়া ঘোষণা করতে পারে। এই বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও গ্রামের ধর্মীয় নেতারা মাঝে মধ্যে এই জাতীয় ঘোষণা দিয়ে থাকেন। এ জাতীয় ঘোষণার ফলে নৈতিক সীমালঙ্ঘনের জন্য প্রায়শই নারীদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত শাস্তি আরোপ করা হয়।

নারীদের বিরুদ্ধে এ ধরণের আইন বহির্ভূত শাস্তির ঘটনাসমূহ মাঝে মাঝে ধর্মীয় নেতাদের দেয়া ফতোয়ার কারণে ঘটে থাকে। শাস্তির ঘটনাসমূহের মধ্যে বেত্রাঘাত, মারধর এবং অন্যান্য ধরণের শারীরিক সহিংসতা অন্তর্ভুক্ত।

হামলাকারীরা ভুক্তভোগীদের মুখে অ্যাসিড নিক্ষেপ করে বিকৃত এবং প্রায়শই অন্ধ করে দেয়। নারীরাই সাধারণত এ ধরণের ঘটনার শিকার হয়ে থাকে। অ্যাসিড হামলার ঘটনাসমূহ প্রায়শই কোন নারীর বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি বা জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের সাথে সম্পর্কিত কারণে ঘটে থাকে।

যৌন হয়রানি: যদিও ২০০৯ সালের উচ্চ আদালতের নির্দেশনার মাধ্যমে যৌন হয়রানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবুও একাধিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) অনুসারে এ ধরণের হয়রানি, যা "ইভটিজিং" নামে পরিচিত অব্যাহত রয়েছে।

২৭ শে মার্চ, নুসরত জাহান রাফি অভিযোগ আনে যে তার মাদ্রাসার (ইসলামিক বিদ্যালয়ের) অধ্যক্ষ তাকে অফিসে ডেকে নিয়ে অনুপযুক্তভাবে শারিরীক স্পর্শ করে। নুসরাত তার পরিবারকে সাথে নিয়ে থানায় সেই মাদ্রাসা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ দায়ের করে। দায়িত্বরত কর্মকর্তা সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ চিত্রায়িত করেন এবং পরবর্তীতে বিস্তর আকারে অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় ছড়িয়ে দেন। এরপর পুলিশ সেই দোষী অধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করে। একটি পুলিশ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আটককালে অধ্যক্ষ তার অনুগত ছাত্রদের দ্বারা নুসরাতের পরিবারকে তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেয় এবং অভিযোগ প্রত্যাহার না করা হলে নুসরতকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়। ৬ই এপ্রিল, নুসরাতের বক্তব্য অনুসারে, তাকে একটি ভবনের ছাদে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করা হয়, যেখানে বোরকায় ছদ্মবেশী পুরুষ শিক্ষার্থীরা আবার মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য তাকে চাপ দেয়। যখন সে অভিযোগ প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করে, তখন তারা নুসরাতকে জোর করে ধরে বেঁধে আটকে রাখে এবং পরবর্তীতে তার গায়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি বাঁচবেন না এই ভয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে নুসরত তার ভাইয়ের মোবাইল ফোনে ঘটনার একটি বিবৃতি রেকর্ড করে যান। বিবৃতিতে মাদ্রাসার ছাত্র হিসাবে তার আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করেন নুসরাত। ১০ই এপ্রিল নুসরত তার জখমের কারণে মৃত্যু বরণ করেন। তার মৃত্যুর পরে কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসার অধ্যক্ষসহ ১৬ জনকে নুসরাতের মৃত্যুর অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ২৪ শে

অক্টোবর, ফেনী মহিলা ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল দোষী সাব্যস্ত ১৬ জনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। একজন শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার কর্মী এই রায়কে স্বাগত জানান তবে তিনি এ রায়কে অনেকটা ঝাপসা রায় হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি মনে করেন ট্রাইব্যুনালের উচিত অপরাধীদের জড়িত হওয়ার তীব্রতার ভিত্তিতে তাদের স্বতন্ত্রভাবে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জবরদস্তি: জোরপূর্বক গর্ভনিয়ন্ত্রণ বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন খবর পাওয়া যায় নি।

বৈষম্য: সংবিধান আইনে সমান সুরক্ষার অধিকার সহ নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে আইনের চোখে সমান ঘোষণা করে। এটি "রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে" নারী ও পুরুষের সমান অধিকারকে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেয়। মানবাধিকার সংস্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও গুলোর মতে, সরকার সর্বদা সংবিধান অনুযায়ী লিঙ্গ সমতা সম্পর্কিত আইন প্রকৃতভাবে কার্যকর করে না। নারীরা পরিবার, সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আইনানুযায়ী পুরুষের মতো একই আইনী অবস্থান এবং অধিকার ভোগ করতে পারে না। ঐতিহ্যবাহী ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের অধীনে নারীরা সম্পত্তির ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক অংশ পায়। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের অধীনে বিধবা নারীর স্বামীর সম্পত্তি তার জীবদ্দশায় সীমাবদ্ধ এবং তার মৃত্যুর পরে পুরুষ উত্তরাধিকারীদের কাছে তা প্রত্যাবর্তিত হয়।

শিশু

জন্ম নিবন্ধন: যদি কোন ব্যাক্তির বাবা-মা বাংলাদেশী নাগরিক হন তবে সে ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হবে। যদি পিতামাতার জাতীয়তার পরিচয় অজানা থাকে এবং বাচ্চাটি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, অথবা তাদের পিতৃপুরুষ বা পিতামহীরা যদি দেশের কোন অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে থাকে তবে সে জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নাগরিক হবে। সরকার কক্সবাজারে জন্ম নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখে। যদি কোন ব্যক্তি পূর্বপুরুষের মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য হন, তবে তার পিতা বা দাদাকে অবশ্যই ১৯৭১ সাল বা তার পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্ট পেতে জন্ম নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়।

শিক্ষা: আইন অনুসারে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে প্রদান করার বিধান রয়েছে। সরকার দশম শ্রেণির পর্যন্ত মেয়েদের ক্লাসে রাখতে অভিভাবকদের ভর্তুকির ব্যাবস্থা করে। বিনামূল্যে ক্লাস হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষকদের বেতন, বই এবং ইউনিফর্মের খরচ অনেক পরিবারের জন্যই ব্যায়বহুল হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে সরকার লক্ষ লক্ষ পাঠ্যাপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালকাভুক্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে গিয়ে মেয়েদের থেকে ছেলেরা বেশি সংখ্যায় থাকে। অনেক মেয়েরাই মাধ্যমিক সম্পন্ন করতে পারে না। বাল্য বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মেয়েদের সরে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

শিশু নির্যাতন: যৌন নির্যাতন, শারীরিক ও অবমাননাকর শাস্তি, শিশু পরিত্যাগ, অপহরণ এবং পাচারসহ বহু ধরণের শিশু নির্যাতনের বিষয়গুলো গুরুতর ও ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে। শিশুরা সকল ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হয়: বাড়ি, এলাকা, স্কুল, আবাসিক প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র,

ইত্যাদি। আইনে শিশু নির্যাতন ও অবহেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ এ আইন অমান্য করলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা এক লাখ বাংলাদেশী টাকা(১,১৮০ মার্কিন ডলার) জরিমানা বা উভয় শস্তিই প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের (বিএসএএফ) মতে, আইনটি পুরোপুরি ভাবে বাস্তবায়িত হয়নি এবং অন্যান্য অনেক ফৌজদারি মামলার মতো কিশোর মামলাসমূহও প্রায়শই বিচার বিভাগে বিচার বিহীনভাবে পড়ে থাকে। ২০১৬ সালে সরকার ইউনিসেফের সহায়তায়, "চাইল্ড হেল্পলাইন -- ১০৯৮" চালু করে। এ বিনামূল্যে টেলিফোন পরিষেবার সাহায্যে শিশুদের সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণমূলক কর্মকান্ডসমূহ রোধ করার প্রচেষ্টা করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতর "চাইল্ড হেল্পলাইন" হটলাইনটি পরিচালনা করে। এই হটলাইনে দেশের যেকোন জায়গা থেকে যোগাযোগ করা যায় এবং এই হটলাইন বছরে গড়ে প্রায় ৮০,০০০ কল পায়। হটলাইন কেন্দ্রটি উদ্ধারকার্য, সুপারিশ এবং কাউন্সেলিংয়ের মতো পরিষেবা সরবরাহ করে।

জুলাই মাসে বিএসএএফ বছরের প্রথমার্ধে শিশু ধর্ষণের প্রায় ৫০০ টি ঘটনার উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী শিশু ধর্ষণের সংখ্যা ২০১৮ সালের তুলনায় প্রায় ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয় যে ধর্ষণের শিকার শিশুদের মধ্যে দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের সংখ্যাই বেশি। প্রতিবেদনটিতে ধর্ষণ বৃদ্ধির কারণ হিসাবে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও ব্যর্থতার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।

পুরো বছর ধরে ইসলামী মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষক এবং বয়স্ক ছাত্রদের হাতে যৌন নির্যাতনের স্বীকার এমন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা একাধিক অভিযোগের মাধ্যমে নির্যাতনের বিস্তারিত বিবরণ দেয়। এএফপি – এর এক প্রতিবেদন অনুসারে, জুলাই মাসে কমপক্ষে পাঁচটি মাদ্রাসা শিক্ষককে তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ছেলে-মেয়েদের ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। একটি উদাহরণে দেখা যায়, প্রবীণ শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে ১১ বছর বয়সী এক এতিম শিশুকে ধর্ষণ ও শিরশ্ছেদ করার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। বিএসএএফ মন্তব্য করে যে এ ধরণের অপরাধের বিষয়গুলো পূর্বে সংবেদনশীলতার কারণে প্রকাশিত হয়নি। তবে এ ধরণের অপরাধগুলোর সংখ্যা ছিল ব্যাপক। অনেক ছোট ছোট স্কুলে শিক্ষকদের সংখ্যা কম এবং কোন পরিচালনা কমিটি দ্বারা তদারকি করা হয় না।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি পর্যবেক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা সহ নানা অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও শিশু পাচার এবং পাচার হতে রক্ষা পাওয়া শিশুদের অপর্যাপ্ত যত্ন ও সুরক্ষা একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম ও নির্যাতন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক ভাবে নির্দিষ্ট কিছু শিল্পে বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। এছাড়াও শিশু গৃহকর্মীরা তাদের অনানুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে সব ধরণের অপব্যবহারের শিকার হয়।

বাল্যবিবাহ এবং জোরপূর্বক বিবাহ: বিবাহের বৈধ বয়স নারীদের জন্য ১৮ বছর এবং পুরুষদের জন্য ২১ বছর। ২০১৭ সালের একটি আইনে "বিশেষ পরিস্থিতিতে" যে কোন বয়সে নারী এবং পুরুষদের বিবাহের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ আইনের ব্যাপারে শিশু অধিকার সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থাসমূহ এবং উন্নয়নের অংশীদারিদের উত্থাপিত সুপারিশগুলো সরকার এখনও কার্যকর করেনি। ২০১৭ সালে উচ্চ আদালত রায় দেয় যে, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির দায়ের করা একটি রিট আবেদনের জবাবে নাবালিকাকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার বিধান কেন অবৈধ ঘোষণা করা উচিত নয় তা সরকারের ব্যাখ্যা করা উচিত। বাংলাদেশ জাতীয়

মহিলা আইনজীবী সমিতি তাদের আবেদনে যুক্তি দেয় যে মুসলিম পারিবারিক আইন বিবাহকে একটি "চুক্তি" হিসাবে বর্ণনা করে এবং নাবালিকা কোন চুক্তির অংশ হতে পারে না।

সরকারী তথ্য অনুসারে, ২০১১ সালে প্রায় ৫২ শতাংশ মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার হয়। ইউনিসেফের ২০১৮ সালের প্রতিবেদনে এই পরিসংখ্যানটি বেড়ে আনুমানিক ৫৯ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ হ্রাস করার উদ্দ্যেশে সরকার মেয়েদের স্কুল ব্যয়ের জন্য বাধ্যতামূলক পঞ্চম-শ্রেণির স্তর ছাড়িয়ে উপরের স্তরগুলোতেও উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। পিতামাতাদের ১৮ বছরের পূর্বে কন্যাদের বিবাহ না দেওয়ার গুরুত্ব শেখানোর জন্য সরকার এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ বিভিন্ন রকমের ওয়ার্কশপ এবং পাবলিক ইভেন্ট পরিচালনা করে।

শিশুদের যৌন শোষণ: শিশুদের যৌন শোষণের শাস্তি হিসেবে ১০ বছর থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যাবস্থা রয়েছে। শিশু পর্নোগ্রাফি এবং এ জাতীয় সামগ্রীর বিক্রয় বা বিতরণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। জুন মাসে টেরে ডেস হোমস-নেদারল্যান্ডস নামক একটি বেসরকারী সংস্থার প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পথশিশুরা যৌন শোষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে। তবে সামাজিক ও আর্থিক সহায়তার অভাব এবং দীর্ঘ এক অপরাধী বিচার ব্যবস্থার কারণে পথশিশুদের শোষণের আইনী প্রতিকার খুবই কম। প্রতিবেদনটিতে বলা হয় যে যদিও সরকার "বাণিজ্যিক যৌন শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবুও শিশুদের ন্যায়বিচার প্রপ্তির ক্ষেত্রে একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।" প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ঢাকার রাস্তায় বসবাসরত প্রায় ৭৫ শতাংশ মেয়ে শিশু যৌন শোষণের ঝুঁকিতে রয়েছে। পতিতালয়ে কর্মরত অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েরা তাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি উল্লেখ করে নোটারীসহ প্রশংসাপত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়াও কিছু বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও দাবি করে যে দুর্নীতিগ্রস্থ সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা এই ধরণের চর্চাকে তাদের নিজেদের উদ্দ্যেশ্য হাসিলের জন্য প্রশ্রয় দিচ্ছে। মে মাসে মানব পাচারকারীরা ২৩ জন কিশোরী রোহিঙ্গা মেয়েকে শরণার্থী শিবির থেকে ঢাকায় পাচার করে (অনুচ্ছেদ ২.চ. দ্রষ্টব্য) । পুলিশ অনুমান করে যে কিশোরী মেয়েরা জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির শিকার হচ্ছে।

বাস্তুচ্যুত শিশুসমূহ: অনুচ্ছেদ ২. ঘ. দ্রষ্টব্য ।

আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণ: দেশটি আন্তর্জাতিক শিশু অপহরণের নাগরিক দিক দিয়ে ১৯৮০ সালে হাগ কনভেনশনের কোনও অংশ বা পক্ষ নয়। আন্তর্জাতিক প্যারেন্টাল শিশু অপহরণ সম্পর্কিত পররাষ্ট্র অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি এখানে দেখুন https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html.

ইহুদিবিদ্বেষ

দেশে কোন ইহুদি সম্প্রদায় ছিল না। তবে রাজনীতিবিদ এবং ইমামগণ তাদের নির্বাচনী এলাকা থেকে সমর্থন লাভের উদ্দ্যেশে বিভিন্ন রকম ইহুদিবিদ্বেষী বক্তব্য ব্যবহার করে বলে জানা গেছে।

মানবপাচার

মানবপাচারের ব্যাপারে পররাষ্ট্র অধিদপ্তরের প্রবেদনটি এখানে দেখুন https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.

প্রতিবন্ধী

আইন প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে কোন প্রকার বৈষম্য করে না। প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিরও সমান ভাবে স্বাধীনতা ও শিক্ষা- চিকিৎসাসহ নানা অধিকার আছে। সরকার প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে এ সকল বিধান কার্যকর করার উদ্দ্যেশে যথেষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বেসকারী সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্যের ভিত্তিতে সহিংসতার ঘটনাগুলো সরকার প্রচন্ড গুরুত্বের সাথে নিয়েছে এবং প্রতিবন্ধীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও নির্যাতনের জন্য দায়ীদের তদন্ত ও শাস্তি দেওয়ার সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আইনানুযায়ী বস্তুগত কাঠামোগুলো শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ব্যাবহার উপযোগীরুপে তৈরি করতে হবে। তবে বাস্তবে সরকার এই আইনের যথাযথ কার্যকরী প্রয়োগ করে নি। উদাহরণস্বরূপ, সরকারী ভবনগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থাকার জন্য বিশেষভাবে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। আইনটির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য স্থানীয় কমিটি গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছিল, তবে বেশিরভাগ কমিটিই সক্রিয় করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলো এই আইনের অধীনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত ছিল না। ২০১৬ সালে বেশ কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা বা এনজিওর দ্বারা প্রস্তুতকৃত একটি প্রতিবেদনে বস্তুগত কাঠামোতে প্রবন্ধিদের জন্য সুবিধাজনক বিশেষ কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে অবহেলার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও ন্যায়বিচারের সুবিধা; প্রতিবন্ধী মহিলাদের অধিকার; শোষণ, সহিংসতা এবং অপব্যবহার থেকে মুক্তি; শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং একটি ভাল কাজের পরিবেশ; কর্মসংস্থানের অধিকার; রাজনৈতিক অধিকার এবং প্রতিনিধিত্ব, ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালিকাভুক্তি, চাকরিতে প্রবেশেসহ সকল কিছুর হিসাব রাখার উদ্দেশ্যে আইনানুযায়ী প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্রের জন্য নিবন্ধনের প্রয়োজন হয়। এই নিবন্ধন তাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে, ভোট দিতে এবং নির্বাচনে অংশ নিতে সহায়তা করে। এখানে বলা হয় প্রতিবন্ধীতা বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের সাথে কোন ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ, অথবা কর্পোরেশন বৈষম্য করতে পারবে না। এ আইনানুযায়ী অক্ষমতার ভিত্তিতে স্কুল, কর্মক্ষেত্র, বা উত্তরাধিকারের জন্য অসম আচরণ করা হলে জরিমানা অথবা তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। যদিও আইনটির বাস্তবায়ন যথেষ্ট অসম ছিল। আইনটির উদ্দেশ্য পূরণে সরকারী সংস্থা এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমের সমন্বয় করার জন্য একটি ২৭ সদস্যের জাতীয় সমন্বয়

কমিটি গঠন করা হয়েছে। আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুরক্ষা কমিটি গঠনে বিলম্ব সহ নানা কারণে আইনটির বাস্তবিক প্রয়োগ অত্যান্ত ধীরগতির।

বেসরকারী সংস্থা অ্যাকশন এগেনস্ট ডিসাবিলিটি অনুসারে, কিছু প্রতিবন্ধী শিশু বিশেষ আবাসনের অভাবে সরকারী স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় নি। সংস্থাটি আরও জানায় যে প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে সহজে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। সরকারের পক্ষ হতে শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া হয়। সরকার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি বরাদ্দ করেছে।

আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাভাবিক ব্যক্তিদের মতো একই তথ্যের অধিকার প্রদান করে। তবে এই অধিকারগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা পরিবার এবং সম্প্রদায়ের গতিশীলতার মাধ্যমে প্রায়শই প্রভাবিত হয়।

আইন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকারী খরচে আইনী পরিষেবা পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকার গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করে। সরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং প্রতিবন্ধিদের উন্নয়নে জাতীয় ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ।

দৈনিক ডেইলি স্টার পত্রিকার মতে, ২০১৯ সালের বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ছিল মোট সরকারী বাজেটের ০.৩১ শতাংশ। প্রয়োজনীয় পরিষেবা বা অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য সম্পদের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিবন্ধিদের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের প্রায় ৮৫ শতাংশ ভাতা প্রদানে ব্যাবহার করা হয়। প্রতিবন্ধী অধিকার রক্ষাকারী সংস্থাগুলো উল্লেখ করে যে এই বরাদ্দকৃত বাজেট বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও দুর্ব্যবহারের জন্য দায়ীদের তদন্তের ব্যাপারে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে পদক্ষেপ নেয়।

মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য সরকারী সুযোগ সুবিধাগুলো অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। স্নায়ুবিক প্রতিবন্ধীতার ব্যাপারগুলো মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় সকল সরকারী মেডিকেল কলেজগুলোতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করে। চিকিৎসা ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ব্যাবস্থার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিদ্যমান। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) গুলো প্রতিবন্ধীদের নানা রকম পরিষেবা প্রদান করে এবং সেই সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষ হয়ে বিভিন্ন কাজ করে। সরকার সমস্ত ৬৪ টি জেলায় ১০৩ টি প্রতিবন্ধী তথ্য এবং পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করেছে যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে পুনর্বাসন পরিষেবা এবং সহায়ক নানা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে থাকে। সরকার প্রতিবন্ধীতার ব্যাপারে গবেষণাসহ নানা রকম সচেতনতামূলক প্রচারকার্য পরিচালনা করে। প্রতিবন্ধী ভাতা সহ সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন অর্থ প্রদানের উদ্দ্যেশে সরকার একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যাবস্থার উদ্বোধন করে।

সরকারের নিষ্ক্রিয়তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নাগরিক জীবনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার অধিকার সীমাবদ্ধ করে।

জাতীয় / বর্ণগত / জাতিগত সংখ্যালঘু

বহুজাতিক হিংস্র উগ্রবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর কোন বড় আক্রমণের ঘটনা ঘটে নি। যদিও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি এবং তাদের প্রার্থণাস্থান মন্দিরে হামলার খবর পাওয়া গেছে। এক ফেসবুক পোস্টে ইসলামের বদনামের জবাবের জের ধরে ২০১৭ সালে রংপুরে প্রায় ৩০ টি হিন্দু বাড়ি ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। পুলিশ এ ব্যাপারে অভিযুক্ত মুসলিম গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করেনি।

বেসরকারী সংস্থাসমূহ জানায় জাতীয় আদিম জনগোষ্ঠী, বর্ণগত এবং জাতিগত সংখ্যালঘুরা প্রায়শই বৈষম্যের মুখোমুখি হয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু দালিত (হিন্দুদের মধ্যে সর্বনিম্ন জাত) জমিজমা, পর্যাপ্ত আবাসন, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নানা ধরণের সীমাবদ্ধতার শিকার।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

বেসামরিক চাকুরী এবং উচ্চ শিক্ষায় চট্টগ্রামের আদিবাসী বাসিন্দাদের অংশগ্রহণের জন্য দেশব্যাপী সরকারী কোটা থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায় ব্যাপক বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। ১৯৯৭ সালের চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিতে স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিষ্ঠার বিধান থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনাগুলো অব্যাহত ছিল। বিশেষত তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক কাউন্সিল সমন্বয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীক বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষমতায়ন এ শান্তি চুক্তির অংশ ছিল। ভূমি কমিশন আইনের অধীনে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কিত মতবিরোধের কারণে চট্টগ্রাম থেকে আদিবাসী ব্যক্তিরা তাদের জমির উপর প্রভাব আনে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে না।

চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাঙালি মুসলমানদের কাছে তাদের জমি হারানোর কথা জানায়। এছাড়া আদিবাসী জনগণের পক্ষপাতী দলগুলো জানায় যে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোকে সাহায্য করার জন্য বন উজাড় করা হচ্ছে। ফলে তাদের জমিতে মারাত্মক রকমের প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের ঘটনা দেখা দিচ্ছে যা আদিবাসীদের জীবনযাপনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। মৌলভীবাজার ও মধুপুর বনাঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন জমির উপর সরকার নানা রকম প্রকল্প নির্মাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার জমি ব্যবহারের ব্যাপারে নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রেখেছে। অবৈধভাবে দখলকৃত সকল জমি তদন্ত এবং ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভূমি কমিশন গঠণ করা হয়েছে। তবে তারা পুরো বছরের মধ্যে কোনও জমিজমা সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তি করেনি। জুলাই মাসে চট্টগ্রামের তিনটি গ্রাম জেলা প্রশাসকের কাছে জসিম উদ্দিন মন্টু নামক এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ দায়ের করে। দৈনিক ডেইলি স্টার প্রত্রিকার একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বের হয়ে আসে যে জসিম উদ্দিন মন্টু চট্টগ্রামে একটি পর্যটন স্থান তৈরির অনুমোদন লাভের উদ্দ্যেশে বান্দরবানের আবাসন নথিপত্র নকল করে। গ্রামবাসীরা জানায়, বান্দরবানে দ্বিতল পুলিশ ক্যাম্প তৈরির জন্য মন্টু চট্টগ্রামে অর্থ এবং ক্রয়কৃত জমির কিছু অংশ অনুদান হিসেবে দেয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অধীনে সংগঠিত, অন্তর্দেশীয় জনগোষ্ঠী সহিংসতায় জড়িত থাকা চাকমা ও মারমা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কয়েক ডজন লোকের মৃত্যু হয়। নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যেশে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফোরাম (ইউপিডিএফ) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে বেশিরভাগ দলীয় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গণমাধ্যম জানায় যে এই দলগুলোর অনেক নেতা চাঁদাবাজিসহ অর্থ, মাদক এবং অস্ত্র পাচারে জড়িত। এদিকে, মৃত্যু এবং সহিংসতার ঘটনাসমূহ অমীমাংসিত থেকে যায়। চট্টগ্রামে আন্তঃদলীয় সহিংসতা তীব্র আকার ধারণ করবে বলে পুরো বছর ধরে সতর্কতা বাণী দিয়ে যাচ্ছে বেসরকারী সংস্থাগুলো।

এপ্রিল মাসে, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফোরাম (ইউপিডিএফ) নেতা এবং আদিবাসী অধিকার কর্মী মাইকেল চাকমা একটি সাংগঠনিক ইভেন্টে তার বাসা ছেড়ে যাওয়ার পরে নিখোঁজ হন। মানবাধিকার গোষ্ঠী ও কর্মীরা তার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য সরকারকে চাপ দেয় এবং দাবি করে যে সরকারী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মাইকেলের করা সমালোচনা তার নিখোঁজ হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ। বছরের শেষ অবধিও এ ব্যাপারে কোন তদন্ত শুরু হয় নি। ১৯৯৬ সালের অপর এক আদিবাসী মানবাধিকার কর্মী কল্পনা চাকমার নিখোঁজের ঘটনার সাথে অনেক পর্যবেক্ষক এই মামলার তুলনা করেন। ১৯৯৬ সালের মামলার তদন্তের জন্য ৩৯ জন কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও, ২০১৮ সালে পুলিশ অপরাধীকে সনাক্ত করতে তাদের সামগ্রিক ব্যর্থতা স্বীকার করে। পুলিশ জানায় যে তারা অপহরণের পর কেবলমাত্র "প্রাথমিক প্রমাণ" পেয়েছিল। ফলে কল্পনা চাকমার উদ্ধারের সম্ভাবনা খুব কমই রয়ে গেছে বলে মনে করে পুলিশ।

বাঙালী প্রতিবেশী ও সুরক্ষা কর্মীদের দ্বারা আদিবাসী নারী এবং শিশুদের উপর ২০১৮ সালে যে যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলো নিষ্পত্তিহীন রয়ে গেছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারীতে রাঙামাটির ওরাছড়ি গ্রামে একটি অভিযানের সময় সুরক্ষা কর্মীরা এক ১৮ বছর বয়সী মারমা মেয়েকে ধর্ষণ করে এবং তার ১৩ বছর বয়সী বোনকে যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে ধর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করলেও প্রশাসনিকভাবে ধর্ষণের জন্য অভিযুক্ত সদস্যদেরকে ব্যাটালিয়নের সদর দফতরের কর্মকান্ডে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। নাগরিক সমাজের চাপে পুলিশ একটি প্রতিবেদন দায়ের করে, তবে গণমাধ্যম ও এনজিও কর্মীদের ধর্ষনে ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে কথা বলতে দেয়া হয় নি।

যৌন দৃষ্টিভঙ্গি এবং লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে সহিংসতা, বৈষম্য এবং অন্যান্য নির্যাতন কর্মকান্ড

সম-লিঙ্গের যৌন ক্রিয়াকলাপ দন্ডবিধির আওতায় অবৈধ। সরকার সক্রিয়ভাবে এ ব্যাপারে তেমন কোন আইন প্রয়োগ করেনি। এলজিবিটিআই গোষ্ঠী জানায় যে সামাজিক চাপের কারণে সরকার এ আইনটি ধরে রেখেছে। এলজিবিটিআই গোষ্ঠীগুলো আরও জানায় যে এলজিবিটিআই ব্যক্তি এবং ব্যক্তিদের যৌন প্রবণতা নির্বিশেষে এলজিবিটিআই হিসেবে হয়রানি করার পাশাপাশি এলজিবিটিআই সংস্থার নিবন্ধন সীমাবদ্ধ করার জন্য পুলিশ আইনটিকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করছে। কিছু গোষ্ঠী পুলিশ কোডের সন্দেহজনক আচরণের কারণে বিভিন্নভাবে হয়রানি হওয়ার কথা জানায়। হিজড়া জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরেই একটি স্বীকৃত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে

সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তবে দুর্বল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংস উগ্রবাদী হামলার নানা ঘটনার ফলে হিজড়া জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে হুমকি, হয়রানি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মুখোমুখি হয়।

এলজিবিটিআই জনগোষ্ঠীর সদস্যরা টেলিফোন, ক্ষুদেবার্তা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা রকম হুমকি পেয়ে আসছে। এ জনগোষ্ঠীর অনেককে পুলিশী হয়রানির শিকারও হতে হয়।

আইন আবাসন, কর্মসংস্থান, জাতীয়তা বিষয়ক বিধান এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো সরকারী পরিষেবাগুলোর ক্ষেত্রে এলজিবিটিআই জনগোষ্ঠীর প্রতি কোন রকম বৈষম্য করে না। তবে এলজিবিটিআই গোষ্ঠীগুলো জানায় যে কর্মসংস্থান, পেশা, আবাসন এবং সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে তাদের প্রায়শই বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

লেসবিয়ান গোষ্ঠীর সহয়তায় থাকা সংস্থাগুলো এখন প্রায় বিরল। যৌন দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে সামাজিক কলঙ্ক প্রদানের ঘটনা খুবই সাধারণ এবং ফলশ্রুতিতে সামাজিক চিন্তাধারা এ বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

সকল ক্ষেত্রে এলজিবিটিআই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। জানুয়ারিতে যেসকল হিজড়া মহিলা হিসাবে চিহ্নিত ছিল তাদেরকে সরকার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যোগ্য *হিজড়া* (তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে।এছাড়াও সরকার জাতীয় ভোটার তালিকায় হিজড়াদেরকে পৃথক একটি তৃতীয় লিঙ্গ বিভাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। ১৪ই অক্টোবর প্রথমবারের মত কোন হিজড়া মহিলা স্থানীয় অফিসে নির্বাচিত হন। সাদিয়া আক্তার পিংকি খুলনার নিকটবর্তী ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জুলাই মাসে পুলিশ একটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল-ইসলামের আট সদস্যের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালের এলজিবিটিআই মানবাধিকারকর্মী জুলহাজ মান্নান এবং মাহবুব রাব্বি তনয়ের মৃত্যুর অভিযোগ আনে।

এইচআইভি এবং এইডস সম্বলিত সামাজিক কলঙ্ক

এইচআইভি বা এইডসের ক্ষেত্রে উচ্চ ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক কলঙ্ক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলো ব্যাবহারে বাঁধা হয়ে দাড়ায়। বিশেষত হিজড়া সম্প্রদায় এবং যেসকল পুরুষ ব্যাক্তি পুরুষদের সাথেই যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেশি।

অন্যান্য সামাজিক সহিংসতা বা বৈষম্য

নাগরিক সমাজের অনেকেই হত্যা বা সংঘর্ষের মাধ্যমে আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য শিশুদের অপহরণ ও বলিদানের ভুয়া খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণ এ নিয়ে নানা রকম সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে। বেসরকারী সংস্থা অধিকারের অনুমান অনুযায়ী, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন দাঙ্গায় কমপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু ঘটে। ২০ জুলাই গৃহবধু তসলিমা বেগমকে ভুলবশত শিশু অপহরণের অভিযোগে জনসাধারণ হত্যা করে। অবৈধ ফতোয়া ও গ্রাম সালিশ জারি করার

বিষয়গুলো প্রচুর পরিমাণে ঘটে। একটি বিশিষ্ট স্থানীয় এনজিও জানায় ধর্মীয় পন্ডিতদের চেয়ে স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতাদের দেওয়া রায়ে এ ধরণের ঘটনাগুলো বেশি ঘটে থাকে।

অনুচ্ছেদ ৭. শ্রমিকের অধিকার

ক. সমিতিতে যোগ দেয়ার স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার

আইনটি সমিতিতে বা ইউনিয়নে যোগ দেয়ার অধিকার দেয় এবং সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার প্রদান করে, যদিও শ্রম অধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে যে ইউনিয়ন নিবন্ধনের কঠোর শর্তগুলো এখনো রয়ে গেছে। আইনানুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি ইউনিয়ন নিবন্ধন অনুমোদনের পূর্বে একটি প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমশক্তির অন্তত ২০ শতাংশের ইউনিয়নের সদস্য হতে সম্মত হতে হবে। ইয়নিয়নের সদস্যসংখ্যা ২০ শতাংশের নিচে নেমে গেলে মন্ত্রণালয় সমিতিটি ভেঙে দেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে পারে। সাধারণত, আইনটি কেবল "প্রাচীর-থেকে–প্রাচীর" (পুরো কারখানার জন্য) ইউনিয়নকে অনুমোদন দেয়। বেসরকারী সংস্থাগুলো জানিয়েছে ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদনকারীদের অনুমোদনের হার গত বছরের তুলনায় এবছর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। আইনের আওতার বাইরে গিয়ে ভুল বা বিচারবহির্ভূত বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে প্রায়শই নিবন্ধনের জন্য প্রেরিত আবেদনগুলো প্রত্যাখ্যান করা হয়।

শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকের সংজ্ঞাতে ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজর ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের শ্রমিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে না। দমকল কর্মী, নিরাপত্তা রক্ষী এবং নিয়োগকারীদের একান্ত সহকারীদের ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার নেই। সরকারি কর্মকর্তাদের এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মচারীদের ইউনিয়ন গঠন করা নিষিদ্ধ। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অন্যান্য কারণেও শ্রম আদালতের অনুমোদন নিয়ে ইউনিয়নগুলোর বৈধতা বাতিল করতে পারে। ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল হলে বা নিবন্ধন অনুমোদন পেতে প্রত্যাখ্যাত হলে ইউনিয়নকে আপিল করার অধিকার দেয় আইনটি। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয় না, যা শ্রম আইনের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখে সরকার ইপিজেডগুলোর জন্য একটি নতুন শ্রম আইন কার্যকর করে। এই আইনগুলো রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা ইপিজেডের কর্মীদের সমিতি গঠন বা যোগদানের অধিকারকে অস্বীকার করে চলেছে।

সম্ভাব্য ইউনিয়নগুলো জানিয়েছে যে শ্রম আইনের তালিকাভুক্ত নয় এমন কারণকে ভিত্তি ধরে তাদের নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখ্যান অব্যাহত ছিল। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জানায় যে গার্মেন্টস সেক্টরে ৫৯৬টি ইউনিয়নসহ প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক নিয়ে পুরো দেশে ৭,৮২৩টি ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। এই পরিসংখ্যাটিতে ২০১৩ সাল থেকে গঠিত তৈরি পোশাক খাতের নতুন ৫৭৪টি ইউনিয়নও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চিংড়ি খাতে ১৬টি ইউনিয়ন এবং চামড়া ও ট্যানারি খাতে ১৩টি ইউনিয়ন রয়েছে। সলিডারিটি সেন্টারের মতে, তৈরি পোশাক খাতে ইউনিয়নগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ প্রতিবেদন বছরে কারখানার বন্ধ বা নিয়োগকর্তাদের পক্ষ থেকে অনৈতিক চর্চার ফলে সক্রিয়তা হারায় এবং বৃহত্তর তৈরি পোশাক কারখানায় ইউনিয়ননিবন্ধন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে। ২০১৪ সালে ট্রেড ইউনিয়ন গঠণের আবেদন ব্যাপক বৃদ্ধি পায়, তবে এর পর থেকে প্রতি বছর এ হার হ্রাস পেতে থাকে।

আইনটি বৈধভাবে ধর্মঘট পালনের অধিকার প্রদান করে, কিন্তু অনেক সীমাবদ্ধতার সাথে। উদাহরণস্বরূপ, ৩০ দিনের বেশি স্থায়ী যে কোনও ধর্মঘট এবং পরিস্থিতি "জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুতর কষ্টকর" হিসাবে গণ্য হলে সরকার ধর্মঘটটি স্থগিত করতে পারে। এছাড়াও, আইনানুযায়ী বিদেশী বিনিয়োগ দ্বারা নির্মিত বা বিদেশী বিনিয়োগকারীর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রথম তিন বছরের মধ্যে ধর্মঘট করা নিষিদ্ধ।

সরকার কখনো কখনো ইউনিয়ন নেতাদের টার্গেট করে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে এবং প্রতিবেদন বছরের জানুয়ারিতে মজুরি নিয়ে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশ টিয়ার গ্যাস, জল কামান, লাঠি ওরাবার বুলেট ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। জানা যায় এ সংঘর্ষে প্রায় কয়েক ডজন শ্রমিক আহত হন এবং কমপক্ষে একজন মৃত্যু বরণ করেন। পরবর্তীতে কারখানা মালিকগণ হাজার হাজার শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। অর্ধশতাধিক শ্রমিক ও ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়েক সপ্তাহ তারা কারাগারে কাটান। সলিডারিটি সেন্টারের মতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শত শত শ্রমিকের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো বছর শেষে ঝুলন্ত থেকে যায়। বেশ কয়েকটি কোম্পানি যথাযথ ক্ষতিপূরণ না দিয়েই অবৈধভাবে হাজার হাজার শ্রমিককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে বা ছাটাই করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিরুপ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সক্রিয় ইউনিয়ন নেতাদের চিহ্নিত করে এবং তাদেরকে কর্মচ্যুত করার লক্ষ্যে কালোতালিকাভূক্ত করে। ভয় দেখানোর অন্যান্য কৌশলগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইউনিয়ন সভা ও অফিসগুলোতে ঘন ঘন পুলিশ পরিদর্শন, পুলিশের ইউনিয়ন সভার ছবি ও ভিডিও চিত্র ধারণ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সমর্থক বেসরকারী সংস্থাগুলোর উপর পুলিশী পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। ২০১৬ সালে আশুলিয়ার ব্যাপক শ্রমিক অস্থিরতায় ছাঁটাই হওয়া বেশিরভাগ শ্রমিক পুনঃনিয়োগ পেয়েছেন। তবে আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলি বিচারাধীন ছিল।

২০১৬ সালে আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক অশান্তির প্রতিক্রিয়ায়, পোশাক শিল্পে নানা সমস্যা নিরসনের উদ্দ্যেশে সরকার একটি স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক কাউন্সিল গঠন করে। বেসরকারী সংস্থাগুলো জানায়, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক কাউন্সিল সক্রিয় নয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ২০ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিলের সভাপতি এবং সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কাউন্সিলটিতে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারস অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ছয় প্রতিনিধি, সরকারের ছয় জন অতিরিক্ত প্রতিনিধি এবং ছয় জন শ্রমিক প্রতিনিধি রয়েছেন। বছরে অন্তত তিনবার কাউন্সিলের সভা হওয়ার কথা, তবে সভাপতি চাইলে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আহ্বান করতে পারেন। শ্রমিক নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা নির্বাচিত নন। এছাড়াও এদের কেউ কেউ তৈরি পোশাক শিল্পে সক্রিয় নন এবং তারা খুব ছোট ফেডারেশনের নেতা বা মালিকপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল।

আইনগতভাবে নিবন্ধিত ইউনিয়নগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কালেক্টিভ বার্গেইনিং এজেন্টস (সিবিএ) হিসাবে পরিচিত। সিবিএগুলো নিয়োগকর্তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে দাবিদাওয়া জমা দেওয়ার এবং এর জন্য দরকষাকষি করার অধিকারী। এ ধরণের ঘটনা বাস্তবে বিরল, তবে এ ধরণের ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। ইউনিয়ন সদস্যদের আইনী অধিকার প্রয়োগের ফলে যদি তাদের

বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মত অন্যায্য শ্রমচর্চা দেখা যায় তবে আইনানুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান রয়েছে। শ্রমিক সংস্থাগুলো জানায় যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নগুলো ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারায় শ্রমিকগণ তাদের দরকষাকষির অধিকার প্রয়োগ করেননি। কিছু ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে প্রতিশোধ্মূলক ব্যবস্থার ভয়ে শ্রমিকগণ দরকষাকষির অধিকার প্রয়োগ করেননি।

আইনে কর্মসূচি গ্রহণে নিয়োগকর্তাদের হস্তক্ষেপ থেকে ইউনিয়নগুলোকে মুক্ত রাখার বিধান রয়েছে। তবে বিশেষত তৈরি পোশাক শিল্পের নিয়োগকর্তারা প্রায়শই এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। শ্রমিক নেতাগণ জানিয়েছেন যে সংগঠনের পরিবেশকে ভীত সন্ত্রস্থ রাখার লক্ষ্যে কৌশল হিসেবে হুমকি প্রদান, হয়রানি, কর্মী ছাঁটাই এবং নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দ্বারা তদন্ত করা ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারী সংস্থাগুলো অভিযোগ করে যে নিয়োগকারীদের দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত হওয়ায় চাকরিচ্যুত ইউনিয়ন সদস্যরা এ সেক্টরে আর চাকরী পান না। বিজিএমইএ জানায় যে কিছু কারখানার মালিক সংগঠিত শ্রমিকদের দ্বারা হুমকিসহ নানা রকম হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন। তবে এ ধরণের অভিযোগের সমর্থনে পরিসংখ্যান বা উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

শ্রম আইন অনুসারে, ৫০ জনের বেশি শ্রমিক রয়েছে এমন প্রতিটি কারখানায় একটি পার্টিসিপেশন কমিটি (পিসি) থাকা প্রয়োজন। ২০১৮ সালে শ্রম আইনের একটি সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে কোন কারখানায় নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে সেখানে কোন পার্টিসিপেশন কমিটি (পিসি) থাকবে না। নিয়োগকর্তারা প্রায়শই এই পদগুলোর জন্য শ্রমিক নির্বাচনের অনুমতি দেওয়ার পরিবর্তে পিসির জন্য কর্মীদের বাছাই বা নিয়োগ করেন। এছাড়াও পিসির কার্যকারিতা এবং স্বতন্ত্রতা নিশ্চিত করতে নিয়োগকর্তাগণ আইন ও বিধিমালা মেনে চলতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার "বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ প্রোগ্রামের মতে, প্রায় ৭৫ শতাংশ কারখানায় অকার্যকর বা ব্যর্থ পিসি রয়েছে।

একটি পৃথক আইনী কাঠামো নিয়ে ইপিজেডগুলিতে, যেখানে প্রায় ৪৫৮,০০০ শ্রমিক রয়েছেন, শ্রম অধিকার পরিচালনা করে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। ইপিজেড আইন শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত শ্রমিক কল্যাণ সমিতির (WWAs) ক্ষেত্রে সমিতিসংক্রান্ত ও দরকষাকষির বিষয়ে সীমিত কিছু অধিকার দেয়,যেমন সম্মিলিতভাবে দরকষাকষির অধিকার এবং কোন বিরোধে সমিতির প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য প্রেরণ ইত্যাদি। তবে ইপিজেডের মধ্যে ইউনিয়ন নিষিদ্ধ। ইপিজেডের পূর্ববর্তী বিধানে কারাদন্ডের সাজা সহকারে সকল ধরণের ধর্মঘট নিষিদ্ধ ছিল। ইপিজেড আইনের এ বিধানটি ২০১৩ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু আইনটি ধর্মঘটের অধিকারের উপর কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বেপজার চেয়ারপারসন যে হরতাল বা ধর্মঘটকে জনগণের পক্ষে অসুবিধাজনক বলে বিবেচনা করবেন, সে ধর্মঘটকে তিনি নিষিদ্ধ করতে পারবেন। আইনটি ইপিজেড শ্রম ট্রাইব্যুনাল, আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং মীমাংসাকারী গঠন করার ব্যবস্থা প্রদান করে, তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর পরিবর্তে আটটি শ্রম আদালত এবং একটি আপিল শ্রম আদালত ইপিজেডের মামলাগুলোর শুনানি করে। বেপজার নিজস্ব পরিদর্শন ব্যবস্থা রয়েছে যা শ্রম কাউন্সিলরদের সাথে পরিদর্শক হিসেবে কাজ করে। ইপিজেড এলাকায় বাইরের কোন রাজনৈতিক দল, ইউনিয়ন, ফেডারেশন বা বেসরকারী সংস্থার সাথে শ্রমিক কল্যাণ সমিতির

(WWAs) যেকোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ। ইপিজেডগুলোতে আইনী ধর্মঘটের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সরকার ইউনিয়ন নিবন্ধণের ব্যাপারে আদর্শ পরিচালনা পদ্ধতি (এসওপি) গ্রহণ করেছে। ইপিজেডগুলোতে শ্রমিক সুরক্ষা এবং সমিতি গঠনের অধিকারের সীমাবদ্ধতার ব্যতিক্রমের সাথে শ্রম আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য নিষিদ্ধ। শ্রম আদালত ইউনিয়ন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য বরখাস্ত হওয়া শ্রমিকদের পুনঃনিয়োগের আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে পুনঃনিয়োগেরঘটনা বিরল।

সরকার ধারাবাহিকভাবে বা কার্যকরভাবে প্রযোজ্য আইন সবসময় প্রয়োগ করেনি। উদাহরণস্বরূপ, শ্রম আইন একটি শ্রম আদালতের মাধ্যমে সকল ধরণের সমঝোতা, সালিসি এবং বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রম আইন আরও প্রতিষ্ঠিত করে যে শ্রমিক ইউনিয়নের শ্রমিকদের কোন দাবীদাওয়ার নিষ্পত্তি না হলে তারা হরতাল করার অধিকার রাখে। খুবই অল্প সংখ্যক ধর্মঘট জটিল আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তবে ধর্মঘট বা কর্মস্থল ত্যাগ করার ঘটনা প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে।

খ. জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধকরণ

আইন অনুযায়ী সকল ধরণের জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ। এ জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে শাস্তিসমূহ এ ধরণের অপরাধ রোধের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত। বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারী পরিদর্শন ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর হয়নি। সম্পদ, পরিদর্শন এবং প্রতিকারের প্রচেষ্টা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ আইন আরও জানায় যে জোরপূর্বক শ্রমের শিকার ব্যক্তিগণও যাতে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের মত আশ্রয় ও অন্যান্য সুরক্ষামূলক পরিসেবা পেতে পারেন।

চাকুরির প্রস্তাব দিয়ে বিদেশে কাজের জন্য জালিয়াতির নিয়োগপত্র দিয়ে কিছু ব্যক্তিকে বিদেশে পাঠান হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাদেরকে শোষণ করা হয়েছিল; তাদেরকে ঋণ দাসত্বের শর্তে কাজ করান হয়েছিল এবং শ্রমের জন্য বাধ্য করা হয়েছিল। অনেক অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে গিয়ে ঋণের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। আইনগতভাবে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির অধীন এজেন্সিগুলো এবং অবৈধভাবে অনুমোদনহীন সাবএজেন্টগণ শ্রমিকদের উপর এটি চাপিয়ে দেয়।

শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদেরও বাধ্যতামূলক দাসত্ব ও শ্রমে বাধ্য করা হয়েছিল, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল সীমাবদ্ধ চলাফেরার সুযোগ, মজুরিহীন শ্রম, হুমকি দিয়ে শ্রমে বাধ্য করা এবং শারীরিক বা যৌন নির্যাতন করা (অনুচ্ছেদ ৭.গ. দ্রষ্টব্য) ।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মানব পাচার বিষয়ক প্রতিবেদনটি এখানে দেখুন
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/

গ. নিষিদ্ধ শিশুশ্রম ও কর্মসংস্থানের ন্যূনতম বয়স

আইন শিশুদের কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ করে এবং কাজের ধরন ও শিশুর বয়সের উপর বিধানগুলো

নির্ভর করে। শ্রম আইনের ২০১৮-এর সংশোধনীতে কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই শ্রমের জন্য সর্বনিম্ন বয়স ১৪ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বিপজ্জনক কাজের জন্য সর্বনিম্ন বয়স ঠিক করা হয় ১৮। শিশুদের জন্য হালকা কাজের বিধানগুলোর পরিবর্তনসহ সংশোধণীতে যে সকল পরিবর্তন এসেছে সকল শ্রমিক পরিদর্শককে সে সকল বিধানের বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে বলে সরকার জানিয়েছে। পূর্বে, এই আইনে ১২ বা ১৩ বছর বয়সী শিশুদের হালকা কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

অপ্রাপ্তবয়স্করা প্রতিদিন ৫ ঘন্টা করে সপ্তাহে ৩০ ঘন্টা কারখানাগুলোতে কাজ করতে পারবে। অথবা ভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে দিনে ৭ ঘন্টা করে সপ্তাহে ৪২ ঘন্টা কাজ করতে পারবে। আইনানুযায়ী প্রত্যেক শিশুকে অবশ্যই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে পড়ার সুযোগ করে দিতে হয়। শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় কারণ হিসেবে কাজ করে। যেমন বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভাব এবং বই ও ইউনিফর্মসহ শিক্ষার সাথে সংস্লিষ্ট ব্যয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি বড় শহরগুলির অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল এবং কর্তৃপক্ষ রপ্তানিযোগ্য পোশাক ও চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ খাতের বাইরে খুব কমই শিশুশ্রম আইনের প্রয়োগ করেছিল। কৃষিসহ অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলোতে সরকারী তত্ত্বাবধান না থাকার ফলে বিপুল সংখ্যক শিশুদের শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

আইনটি নিকৃষ্টতম সকল শিশুশ্রমকে নিষিদ্ধ করে না। শুঁটকি মাছ উৎপাদন ও ইটের ভাটাসহ শিশুরা নানা নিকৃষ্টতম শ্রমের সাথে যুক্ত। পোশাক ও চামড়া শিল্পেও শিশুরা নানা রকম ঝুঁকিপূর্নকাজে নিযুক্ত ছিল। অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করা শিশুরা আইনের আওতাভুক্ত নয় এবং আইনে শিশুদের বিপজ্জনক কাজে নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক নয়। তদুপরি, শ্রম বিষয়ক পরিদর্শকের সংখ্যা শ্রমিকদের সংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল।

শিশুশ্রম লঙঘন করার অভিযোগে নির্ধারিত সাজাসমূহ এ ধরণের লঙঘন রোধে যথেষ্ট নয়। সরকার মাঝেমধ্যে গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনকারী নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনে।

গৃহস্থালি কাজকর্ম ও অনানুষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিল। ঢাকার বস্তিগুলোর প্রায় ২,৭০০ পরিবারের উপর করা জরিপের ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ওভার্সিস ডেভলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন অনুসারে, ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ স্কুল ত্যাগ করেছিল এবং পূর্ণকালীন শ্রমেনিযুক্ত ছিল। এই শিশুরা জাতীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত ৪২-ঘন্টা কাজের সীমা ছাড়িয়ে আরও বেশি কাজ করছিল।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে, ছেলেদের জন্য প্রাথমিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র ছিল কৃষি এবং মেয়েদের জন্য প্রধান ক্ষেত্র ছিল সেবা খাত। চট্টগ্রামে জাহাজভাঙ্গা শিল্পের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে এমন একটি এনজিও ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশনের মত অনুসারে, চট্টগ্রামের জাহাজভাঙ্গা শিল্পের কর্মীদের প্রায় ১১ শতাংশের বয়স ১৮ বছরের কম। শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্মের মতো বেসরকারী সংস্থাগুলো জানায় যে শ্রমিকরা কোন রকম প্রশিক্ষণ, সুরক্ষা সরঞ্জাম, ছুটি, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং চুক্তিবদ্ধ হওয়া ছাড়াই দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছে।

শিশুরা অনিবন্ধিত তৈরি পোশাক কারখানা, সড়ক পরিবহন খাত, উৎপাদন খাত এবং পরিষেবা শিল্পসহ প্রায়শই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজে নিযুক্ত ছিল।

২০১৮ সালে সরকার শিশুশ্রম অপসারণের উদ্দেশ্যে কাজ করে এমন কর্মসূচিগুলোতে অর্থায়ন করে ও অংশ নেয়। সরকার একটি ৩৫ মিলিয়ন ডলারের তহবিল সম্বলিত তিন বছর মেয়াদী প্রকল্প হাতে নেয় যেখানে প্রায় ১০০,০০০ শিশুশ্রমিককে চিহ্নিত করে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করার লক্ষ্য স্থাপন করা হয়। এছাড়াও এ প্রকল্পে শিশুশ্রমিকদের পিতা মাতাদেরও জীবিকা নির্বাহের জন্য সহায়তা করা হয়।

শরণার্থী শিবিরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা শিশুরা বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে ছিল। রোহিঙ্গা মেয়েদের শিবির থেকে ঢাকায় বা অন্য দেশে গৃহস্থালির কাজের উদ্দ্যেশ্যে পাচার করা হয়েছিল। শরণার্থী শিবিরের বাইরে নিয়োগপ্রাপ্ত রোহিঙ্গা শিশুরা বিনা বেতনে বা কম বেতনে কাজ করছে। অনেক ক্ষেত্রেই রোহিঙ্গা শিশুদের মাত্রাতিরিক্ত কজ করতে হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হতে হয়েছে।

এছাড়াও শিশুশ্রমের সবচেয়ে খারাপ ধরনগুলোর ব্যাপারে জানতে লেবার ডিপার্টমেন্টের অনুসন্ধানগুলো এখানে দেখুন
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings

এবং শিশুশ্রম বা বাধ্যতামূলক শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসমূহের তালিকা এখানে দেখুন
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods

ঘ. কর্মসংস্থান এবং পেশায় বৈষম্য

শ্রম আইন অনুযায়ী লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধীতার ভিত্তিতে মজুরি বৈষম্য নিষিদ্ধ। তবে এটি লিঙ্গ, প্রতিবন্ধীতা, সামাজিক অবস্থান, বর্ণ, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি বা অনুরূপ কারণের ভিত্তিতে অন্যান্য বৈষম্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে না। সংবিধান অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিকূল বৈষম্য নিষিদ্ধ করে এবং সরকারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এ নিষেধাজ্ঞা স্পষ্ট। এতে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উপকারের জন্য সরকার ইতিবাচক কর্মসূচি বা পদক্ষেপ নিতে পারে।

নিম্নমজুরির পোশাক খাত প্রচলিতভাবে নারীদের জন্য বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। পরিসংখ্যান অনুসারে নারীরা তৈরি পোশাক-খাতের বেশিরভাগ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করছে। তৈরি পোশাক কর্মীদের প্রায় ৫০ শতাংশেরও বেশি নারী শ্রমিক। যদিও তথ্যের অভাবের কারণে পরিসংখ্যানগুলোয় ভিন্নতা দেখা যায়। নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তদারকি ও ব্যবস্থাপনা পদে কাজ করেন এমন নারীর সংখ্যা কম। এছাড়াও একই রকম কাজ করেও পুরুষের থেকে নারীদের উপার্জন কম। সেন্টার ফর ইকোনমিক রিসার্চ এন্ড গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন ইকোনমিক্স ইন্সটিটিউট এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও রপ্তানীমুখী পোশাক কারখানায় নারীরা তুলনামূলক কম মজুরী পান। সমীক্ষা অনুসারে, দুই-তৃতীয়াংশ মজুরির ব্যবধানটি নারীরা দক্ষতা নিয়ন্ত্রণের পরেও অব্যাহত ছিল, যা পুরুষ শ্রমিকদের জন্য উচ্চ গতিশীলতার কারণ বলে উল্লেখ

করা হয়েছে। যৌন হয়রানিসহ কারখানাগুলোতে নারীরা নানা রকম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। জুনে একটি বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থা সমীক্ষা চালানোর পরে জানায় যে প্রায় ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক পোশাক কারখানায় লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়।

চা শিল্পে নারী কর্মীরা বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছেন। পুরুষ শ্রমিকরা তাদের স্ত্রীদের জন্য রেশন হিসেবে চাল পেয়ে থাকেন। তবে পুরুষদের নারীদের উপর নির্ভরশীল হিসাবে বিবেচনা করা হয় না বলে চা শিল্পের নারী শ্রমিকদের স্বামীদের জন্য চালের রেশন বরাদ্দ দেওয়া হয়না।

কিছু ধর্মীয়, নৃগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিশেষত বেসরকারী ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা জানিয়েছে (অনুচ্ছেদ ৬ দ্রষ্টব্য)।

ঙ. গ্রহণযোগ্য কর্মস্থলের অবস্থা

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড খাত-ভিত্তিক ন্যূনতম মাসিক মজুরি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ বোর্ড যে কোন সময় সভা আহ্বান করতে পারে। তবে শিল্পক্ষেত্রে মজুরী নির্ধারণের উদ্দ্যেশে পাঁচ বছরের মধ্যে কমপক্ষে একবার ত্রিপক্ষীয় ফোরামের বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। প্রতিবেদন বছরে মজুরি বোর্ড একজন বৈধ শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। শ্রমিক প্রতিনিধি ছাড়া গার্মেন্টস শ্রমিকদের নতুন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য আলোচনায় তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ ছিলেন না। আইন অনুসারে সরকার নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের পরামর্শক্রমে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মজুরি কাঠামো সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারে। এক মাসের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি ৯৪ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং এটি কেবল তৈরি পোশাক খাতের জন্য নির্ধারিত ছিল। এই মজুরি দারিদ্র্যসীমার উপরে ছিল। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুসারে, ২০১০ সাল থেকে মুদ্রাস্ফীতি গড়ে বার্ষিক ৬ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। তবে বোর্ড মাঝেমধ্যে কিছু খাতে মজুরিতে জীবন-যাপনের সামঞ্জস্য ঠিক রাখার জন্য পরিবর্তন আনে।

বেপজার দেয়া তথ্য অনুসারে তৈরি পোশাক খাতে মজুরি প্রায়শই ন্যূনতম মজুরির চেয়ে বেশি এবং ইপিজেডগুলোতে এ মজুরি সাধারণ মজুরি স্তরের চেয়ে তুলনামূলক বেশি। ২০১৮ সালের নভেম্বরে বেপজার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইপিজেডগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চা প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে মাসে সর্বনিম্ন ন্যূনতম মজুরি ছিল ৩,০৬০ টাকা বা ৩৬.১৪ ডলার। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি চা শ্রমিক পরিবার নিরাপদ পানি, বিদ্যুৎ বা স্বাস্থ্যসেবা ছাড়াই মনবেতর জীবনযাপন করছে। তাঁরা এমনকি গৃহপালিত পশুর সাথে এক ঘর ভাগ করে বসবাস করছে। ন্যূনতম মজুরির কোনটি দিয়েই নগরে যথাযথভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। ন্যূনতম মজুরিতে মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করা হয়না। তবে মজুরি বোর্ড মাঝেমধ্যে কিছু খাতে জীবন-যাপনের খরচের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি পরিবর্তন করে থাকে।

আইনানুযায়ী একটি আদর্শ কর্ম দিবস আট ঘন্টায় হয়। একটি আদর্শ কর্ম সপ্তাহ হল ৪৮ ঘন্টা, তবে এটি ৬০ ঘন্টা পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে, যা মূলত অতিরিক্ত কাজের সময় হিসেবে ধরা হয় এবং এর জন্য প্রাপ্য মূল্য মূল মজুরির দ্বিগুণ। ওভারটাইম বাধ্যতামূলক হতে পারে না।

শ্রমিকরা যদি দিনে ছয় ঘন্টার বেশি কাজ করেন তবে তাদের এক ঘন্টা বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে। অথবা যদি শ্রমিকরা দিনে পাঁচ ঘন্টার বেশি কাজ করেন তবে তাদের আধা ঘন্টা বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে। কারখানার শ্রমিকদের সপ্তাহে একদিন ছুটি পাওয়ার কথা রয়েছে। দোকান কর্মীরা সপ্তাহে দেড় দিনের ছুটি পান।

আইনে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার মানদণ্ড প্রবর্তন করে এবং আইনের সংশোধনী দ্বারা বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করে। আইনে বলা হয়েছে যে প্রতিটি শ্রমিককে সম্পূর্ণ বেতনে বছরে কমপক্ষে ১১টি উৎসব ছুটির দিনের অনুমতি দিতে হবে। উৎসবের দিনগুলি এবং তারিখসমূহ নিয়োগকর্তাগণ সিবিএ- এর সাথে পরামর্শ করে বা সিবিএ- এর অনুপস্থিতিতে পার্টিসিপেশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে স্থির করার কথা।

শ্রম আইনের বাস্তবায়নকারী বিধিগুলো কারখানায় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াটির রূপরেখা দিয়েছে এবং সরকার জানিয়েছে যে জুলাই ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ২,১৭৫টি নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোতে সিবিএ মনোনীত ব্যবস্থাপনার প্রতিনিধি ও শ্রমিক উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অথবা, সিবিএ অনুপস্থিতিতে কারখানার ওয়ার্কার পার্টিসিপেশন কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। যেখানে কোন ইউনিয়ন বা ওয়ার্কার পার্টিসিপেশন কমিটি নেই সেখানে কারখানা ও স্থাপনা পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) তাদের শ্রমিকদের মধ্যে থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে।

সরকার ন্যূনতম মজুরি, কর্মঘন্টা, ওভারটাইম পরিশোধ ও পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের মানের ব্যাপারে আইনগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি। তৈরি পোশাক শিল্পের দিকে মনোযোগ বাড়ানোর ফলে কিছু কিছু পোশাক কারখানায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে কিন্তু অন্যান্য খাতগুলোয় সম্পদ, পরিদর্শন ও প্রতিকারমূলক পদক্ষেপগুলো পর্যাপ্ত ছিল না। এছাড়া, বিধি লংঘনের জন্য প্রদত্ত সাজাসমূহ বিধি লংঘন প্রতিরোধে যথেষ্ট ছিল না। একটি বেসরকারী শ্রম অধিকার সংস্থা জানায় যে প্রায় ৯৫ শতাংশ কারখানা ওভারটাইমের সীমা মেনে চলে না।

ডিআইএফই-এর (DIFE) সম্পদ বা ব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিদর্শনকার্য সম্পন্ন ও প্রতীকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অপ্রতুল ছিল। ৪ মার্চ আশুলিয়ার একটি পোশাক গুদামে আগুন লেগে পুরো কারখানার ক্ষতি হয়। ডিআইএফই-এর ওয়েবসাইট অনুসারে, তারা ২০১৩ সালের ২৬ অক্টোবর সর্বশেষ কারখানাটি পরিদর্শনে গিয়েছিল। ডিআইএফই-এর অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা শোনা যায়। বর্তমান ব্যবস্থায় কোন কর্মী অভিযোগ করতে চাইলে তাকে তার নাম, পদবি ও পরিচয়পত্র নম্বর ডিআইএফই-এর অভিযোগ ফর্মে উল্লেখ করতে হয়। অভিযোগ জমা হয়ে গেলে ডিআইএফই কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিষদের কাছে অভিযোগকারীর ফর্ম উল্লেখপূর্বক একটি চিঠি প্রেরণ করে। এই ব্যবস্থার ফলে অভিযোগকারী শ্রমিকের সুরক্ষার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং সেই সাথে প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়।

২০১৩ সালের রানা প্লাজা ভবন ধসে ১,১৩৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং ২,৫০০ জনেরও বেশি শ্রমিক আহত হন। এই ভবন ধসের ঘটনার পরে বেসরকারী সংস্থাসমূহ, বিদেশি সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ প্রায় ৩,৭৮০টিরও বেশি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করার জন্য (বাংলাদেশ) সরকারের সাথে কাজ করে। অনেক কারখানায় তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দ্যেশে নানা পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে। অপর্যাপ্ত অর্থসংকলনসহ নানা কারণে এ ধরণের

প্রতিকার পদক্ষেপ ধীর গতিতে পরিচালিত হয়। দুটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ -- নিরাপণ ও অ্যাকর্ড -- যেসকল কারখানায় নিরাপণ ও অ্যাকর্ড-এর সদস্য ব্র্যান্ডগুলোর জন্য পোশাক তৈরি সেসব কারখানায় তারা পরিদর্শন ও প্রতীকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কাজের তদারকি অব্যাহত রাখে। নিরাপণের বেশিরভাগই উত্তর আমেরিকার ব্র্যান্ড এবং তারা এল্যায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কারস সেফটি'র হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অ্যাকর্ড অন ফায়ার এন্ড বিল্ডিং সেফটি বা "অ্যাকর্ডের" বেশিরভাগই ইউরোপীয় ব্র্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত। এ উদ্যোগ বহির্ভূত পোশাক কারখানাগুলোয় পরিদর্শনের ও প্রতীকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারী তদারকি ছিল সীমিত। ব্র্যান্ড দুটির নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলো তৈরি পোশাক শিল্পের কেবল সদস্য কারখানাগুলোতেই নেয়া হয়। এর বাইরে হাজার হাজার অন্যান্য পোশাক কারখানাসহ অন্যান্য খাতের কারখানাগুলো বিনা তদারকিতেই চলে আসছে। বয়লার বা রাসায়নিক বিস্ফোরণের মত ঘটনা শিল্পক্ষেত্রে আগুন সম্পর্কিত দুর্ঘটনা ছাড়াও অন্য দুর্ঘটনার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে।

মে মাসে আদালত নির্দেশিত একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে অ্যাকর্ডকে সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে বিজিএমইএ, আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতাদের প্রতিনিধিত্ব সহকারে তৈরি পোশাকের একটি টেকসই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়।

হত্যাসহ অন্যান্য অভিযোগে রানা প্লাজার মালিক ও অন্য ৪০ জন ব্যাক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা ২০১৬ সালে শুরু হয়। এন্টিগ্রাফ্ট কমিশনে ব্যক্তিগত সম্পদের হিসাব দিতে ব্যর্থ হওয়ায় রানা সর্বোচ্চ তিন বছরের সাজা পেয়েছিলেন। রানা ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে হত্যার বিচার আপিল ও হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের কারণে বার বার স্থগিত হয়।

সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে চেয়ারম্যান মাহমুদা আক্তার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেলোয়ার হোসেনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার পর ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে তাজরিন ফ্যাশনস অগ্নিকাণ্ডের মামলার বিচার শুরু হয়। এ মামলাটি এখনও চলমান রয়েছে।

শ্রমিক সংঠনগুলো জানায় যে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য মান পর্যাপ্ত ছিল এবং আরও অনেক কারখানা এগুলোকে মেনে চলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। আইনটি অমান্য বা অগ্রাহ্য করার জন্য জরিমানার বিধান রয়েছে কিন্তু এতে আইনটি লঙ্ঘন করা বন্ধ হয়নি। অনেক তৈরি পোশাক নিয়োগকর্তাগণ আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও বিপজ্জনক উপকরণ সম্পর্কে কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিতে, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করতে বা নিরাপত্তা কমিটিগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হন।

কর্মঘন্টার আইনী সীমা নিয়মিত লঙ্ঘন করা হয়। তৈরি পোশাক খাতে নিয়োগকর্তাগণ রপ্তানির সময়সীমা পূরণের লক্ষ্যে প্রায়শই শ্রমিকদের দিনে ১২ ঘন্টা বা তার বেশি সময় ধরে খাটান। তবে তারা তাদের কর্মীদের সময়ের জন্য সবসময় যথাযথ মজুরি দেননি। সলিডারিটি সেন্টারের মতে, শ্রমিকরা প্রায়ই স্বেচ্ছায় আইনী সীমা ছাড়িয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করে থাকেন। নিয়োগকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধে বিলম্ব বা ছুটি দিতেঅস্বীকার করেন।

বৃহত্তর অনানুষ্ঠানিক খাতটি সম্পর্কে স্বল্প নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। এ বৃহত্তর অনানুষ্ঠানিক খাতটিতেই বেশিরভাগ শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে। এ খাতে শ্রম আইনগুলো কার্যকর করা কঠিন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ২০১৬ সালে অনানুষ্ঠানিক শ্রম খাতে ৫১.৩ মিলিয়ন শ্রমিক রয়েছে যা মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৬.২ শতাংশ।

ফেব্রুয়ারী মাসে পুরান ঢাকার একটি ঐতিহাসিক এলাকা চকবাজারে সিএনজি চালিত গাড়ির বিষ্ফোরণের ফলে আগুন লেগে যায়। বিস্ফোরণটি রাস্তার পাশের রেস্তোঁরাগুলোতে ব্যবহৃত অন্যান্য সিলিন্ডারগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দ্রুত পার্শ্ববর্তী একটি প্লাস্টিকের দোকান এবং অন্য একটি দোকানে আগুন লেগে যায় যেটি অবৈধভাবে রাসায়নিক দ্রব্য মজুদ করেছিল। বিশ্লেষকগণ মনে করেন যথাসময়ে ভবনগুলোতে অনিয়মগুলো দূর করা হলে এই দুর্ঘটনাটি হয়ত এড়ানো যেত। এ দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৭০জন নিহত হন।